ষষ্ঠ অধ্যায়
চরিত্রদের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি

''জগদীশ গুপ্ত স্পষ্টতই কথাশিল্পে মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য প্রভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মানব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বিচিত্র রহস্যময় গতিবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণই যে আধুনিক কথাসাহিত্যের চারিত্র্য লক্ষণ তার সংকেতও আছে এখানে। ... অদৃশ্য মহাশক্তির স্বেচ্ছাচার, অমঙ্গলবোধ, সংশয়চেতনা, বিশ্ববিধানে অনাস্থা, দুঃখবাদ নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক ও যৌনবৃত্তি সমাজবীক্ষণ—তাঁর শিল্প চেতনার, মূলভূমি অধিকার করে আছে। তবে এ-সমস্ত প্রবণতার ভেতরে মানব প্রবৃত্তির অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ মধ্যবিন্দুতে ক্রিয়াশীল থেকেছে।''[১]

মানবদেহকে পোষ্টমর্টেম করলে দেহের বিভিন্ন অংশ ছাড়া 'মন' বলে কোনো স্বতন্ত্র জিনিসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে যদিও 'মন', 'আত্মা' প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা হয়, তবু এই অতি পরিচিত শব্দের সঠিক অর্থ আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। ভারতীয় দর্শনে মন ও আত্মার মধ্যে প্রভেদ করা হয়েছে। 'মন' হল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—যার সাহায্যে অন্তর্দর্শন হয় এবং আমাদের মানসিক অবস্থাগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর 'আত্মা' হল জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তা—যিনি বিষয় জানেন, সক্রিয়ভাবে কর্মে লিপ্ত হন এবং দুঃখ-সুখ ভোগ করে থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে 'mind', 'soul', self' প্রভৃতি শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। 'মন' বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে শুধু দার্শনিকরা নন, শরীরবিদ্‌দের মধ্যেও মত পার্থক্য রয়েছে। উইলিয়াম জেমস্ তার 'The Principles of Psychology' গ্রন্থে মানবদেহে মনের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রদত্ত যুক্তি মতে, মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অনেকগুলি উপায় থেকে একটি উপায় বেছে নেওয়াকে বোঝায় মানসিক ক্রিয়ার লক্ষণ। সেদিক থেকে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি হল মনের বিভিন্ন বৃত্তি। এইসব বৃত্তিগুলি আলাদা আলাদা হলেও তাদের মধ্যে একটি সুগভীর যোগসূত্র রয়েছে। এই মানসিক বৃত্তিগুলিকে একত্রে 'মন' বলা যায়। এই মনের স্বরূপ বা লক্ষণ হ'ল চেতনা যার দ্বারা মনকে জড় ও প্রাণ থেকে পৃথক করা যায়। বিভিন্ন মতবাদীরা মনকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে মনের বিভিন্ন দিকগুলি হল—

■ 'মন' বলতে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াগুলির সমষ্টিকে বোঝায়। এদের বাদ দিয়ে কোনো স্থায়ী অপরিবর্তিত সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না।

■ 'মন' বলতে বোঝায় চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলি থেকে স্বতন্ত্র দেহাতিরিক্ত এক স্থায়ী ও অপরিবর্তিত অধ্যাত্ম সত্তাকে।

■ 'মন' বলতে বোঝায় এক মূর্ত আধ্যাত্মিক ঐক্যের সম্বন্ধ—যা চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কোন কিছু নয়, অথচ যা নিজের স্বাতন্ত্র্য না হারিয়ে ওই সব মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে।

বিভিন্ন মতবাদীরা 'মন' সম্পর্কে যত ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে 'মন' হল একটা মানসিক অবস্থার বিভিন্ন বৃত্তিগুলির যোগফল। এই মনের সঙ্গে চেতনার একটি অঙ্গাঙ্গীযোগ রয়েছে। অনেক সময় মন ও চেতনাকে সমার্থক বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। তবে এককথায় চেতনারও সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। চেতনা হল মনের নিজের অবস্থা সম্পর্কে বোধ। এর অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান হল চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া। অচেতনের সঙ্গে এর পার্থক্য নির্দেশ করে মনের ধর্ম বোঝানো হয়ে থাকে। এককথায় কেউ বলেছেন চেতনা হল জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে এক সম্বন্ধ। মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড-এর মতে চেতনা জীবনী শক্তির অচেতন উপাদান থেকেই উদ্ভুত। আবার মনের সঙ্গে দেহের একটা নিবিড় সংযোগ রয়েছে। দেহ যদি আধার হয়, তাহলে মন হল আধেয়। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই যদি শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, তাহলে মনও সতেজ আর খুব ভালো থাকে। শরীর যদি কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে মনেরও জোর কমে যায়। আবার মন যদি প্রফুল্ল থাকে তাহলে শরীরের কর্ম ক্ষমতা বেড়ে যায়। অধ্যাপক প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত দেহ ও মনের এই সম্পর্ক বিষয়ে লিখেছেন—"... মস্তিষ্কে যদি কোন গুরুতর আঘাত লাগে, তবে চেতনা শক্তি লোপ পায়। মস্তিষ্কের বৈকল্য অনেক প্রকার মানসিক রোগের কারণ হয়। মানসিক-অনুভূতির দৈহিক প্রকাশ খুব স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষ ক্রুদ্ধ হলে তার চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, দুঃখে মানুষের চোখ দিয়ে জল ঝরে। মনে আনন্দ হলে মুখভঙ্গির মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটে।"[২] শারীরবিদ্যা বলে, মস্তিষ্কের আকার, ওজন এবং জটিলতার সঙ্গে বুদ্ধির তারতম্যের নিবিড় যোগ আছে। মস্তিষ্কের কোন অংশ কেটে বাদ দিলে তার সঙ্গে যুক্ত চেতনার কাজটি বিকল

হয়ে যায়।

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৮-১৯৩৯) হলেন মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রবর্তক। তিনি তাঁর কয়েকজন শিষ্য মিলে মানুষের অবচেতন ও অচেতন মনের আবিস্কার, বাল্যকালের অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব আরোপ, স্বপ্ন ব্যাখ্যা অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি ইত্যাদির উপর আলোকপাত করে মনোবিজ্ঞানে এক নতুন দুয়ার খুলে দেন। মানুষ সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়, ফলে সেটা সাহিত্য শিল্প-ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব-শিক্ষা-ধর্ম ইত্যাদি জীবনের নানাক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রয়েডের তত্ত্ব সমগ্র মানবজাতিকেই একটা নতুন ভাষ্যে ও আলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মানুষের মন, মনন, নিদ্রা, স্বপ্ন, চেতনা-অবচেতনা-মানসিক বৈকল্য ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই একটা নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে ফ্রয়েডীয় চিন্তাও নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে। এবং এটাই স্বাভাবিক। মানুষের মন ও চিন্তনকে প্রথম প্রচলিত ধারণা থেকে আলোয় এনেছিলেন ফ্রয়েড। দীর্ঘকাল তাঁর প্রদর্শিত পথেই মনোবিজ্ঞান এগিয়েছে। তিনি আমাদের মনের যাবতীয় চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিকে দেখেছিলেন যৌনতার নিরীখে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের এইসব বৃত্তিগুলি বাইরের বস্তু দ্বারাও প্রভাবিত হয়—এই দিকটির প্রতি ফ্রয়েড আলোকপাত করেননি। এটা তাঁর সীমাবদ্ধতা, কিন্তু তাঁর মতবাদ আজও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বিশেষ করে বিংশ শতকের সাহিত্য সমাজ-ধর্মের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করতে হয় ফ্রয়েডীয় চিন্তার নিরীখেই। ফ্রয়েড আমাদের মনের উদ্দেশ্যগুলোর উৎসকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছিলেন—

- অদস্ (Id)
- অহং (Ego) এবং
- অধিশাস্তা (Super-ego)

অদস্ (Id) স্তরে ভালোমন্দ বা মূল্যবোধ বলে কোনো কিছু নেই, নীতি নেই আছে কেবল সুখ ভোগ যার কেন্দ্রস্থল হল দেহ। এর আরেকটি নীতি হল মিতব্যয়িতা। কমশক্তি খরচ করে বেশী সুখ পাওয়াই হল অদসের নীতি। আবার মনের চেতনার নিরীখে যে তিনটি স্তর—চেতন (Concious), অচেতন (un-concious) এবং অবচেতন (sub-concious)—সেখানে অবচেতন মন স্বপ্নপূরণ কালেও এই অদস্ কাজ করে থাকে। অহং (Ego)-এর উৎপত্তি অদস্ থেকেই। অদস্ যেমন সুখ-ভোগ নীতির পরিপোষক, অহং (Ego) তেমনি বাস্তবতা

মেনে চলে। ফ্রয়েড অদসের শক্তিকে বলেছেন কাম-প্রেরণা (Libido)। এই অদস্ একেবারেই অন্ধ, যে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। কিন্তু অহং-এর কাজ হল প্রকৃতিগত তাগিদ ও বিষয়াকর্ষণকে বাস্তবতার নিরীখে বিচার করা। বহির্জগতের সংস্পর্শে এলেই কেবল অদস্ তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ বাস্তবতা তার ইচ্ছার সবটুকু সব সময় চরিতার্থ করতে দেয় না। অধ্যাপক সুনীল কুমার সরকার প্রসঙ্গত লিখেছেন—''...বহির্জগত বাস্তবতার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলেই অদস্ থেকে অহং বেরিয়ে আসে। তখন অদস্ বেশ বুঝতে পারে যে তার যা ইচ্ছা তা-ই করা চলবে না, তার অনেক ইচ্ছাকে অবদমিত করতে হবে। আর তা না হ'লে বাস্তবতা তাকে শাস্তি দেবে, ভয় জাগাবে।''[৩] যেমন জন্মের পর শিশুর মধ্যে কেবল অদস্ কাজ করে। সেজন্য সে তার চাহিদা মত মা কিংবা ধাত্রীমাতার স্তন এবং তাদের নিজেদের হাতের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝতে পারে। একটু বড় হলেই তার মধ্যে তার চারপাশের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং সেই সঙ্গে বুঝে যায় যে ক্ষুধার জন্যে কাঁদলে সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দুধ পাওয়া যায় না। এভাবেই তখন থেকে সে নিজের আর বাইরের জগতের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। এইভাবে অদস্ এবং অহং-এর পার্থক্য শিশুর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এরপর বাইরের জগতের সঙ্গে অহং আরেকটি পৃথক অবস্থা বা স্তর গঠন করে। ফ্রয়েড একেই বলেছেন অধিশাস্তা (Super-ego)। এরই প্রয়োগগত রূপ হল নৈতিকতা। অহং যখন অদসের কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাকে (যা সামাজিক বা নৈতিকভাবে নিষিদ্ধ) চরিতার্থ করতে যায়, তখনই অধিশাস্তা তার মধ্যে সতর্কবাতা পৌঁছে দিয়ে তাকে নিরস্ত করে। সেদিক থেকে অধিশাস্তাকে বলা যায় বিবেক। এই বিবেকবোধ শিশু লাভ করে তার পরিবার এবং পরিপার্শ্ব থেকেই। এই লাভ করার ক্ষেত্রটি যদি যথেষ্ট বিস্তৃত না হয় তাহলে শিশুর মধ্যে অনৈতিক বা সমাজ নিষিদ্ধ কাজের প্রতি প্রবণতা তৈরী হয়ে যায়। মনের এই তিনটি স্তরের মধ্যে তাই অহং-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই অহংকেই বাস্তবতা, অদস্ আর অধিশাস্তা—এই তিনটি অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেই সমাজ নৈতিকতার নিরীখে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

ফ্রয়েডের পূর্বে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় শুধুমাত্র চেতন (concious) মন এবং তার অস্তিত্ব আর কার্যাবলী স্থান পেত। সেই সংকীর্ণ আলোচনার পরিসরকে ফ্রয়েড প্রথম

প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তার দান করেন। চেতন মনের সঙ্গে যুক্ত হয় অচেতন (un-concious) এবং আচেতন মন (sub-concious) এবং তাদের কার্যক্ষেত্র। চেতন মনের অস্তিত্ব মনের ক্ষুদ্রতম অংশ জুড়ে। এই ক্ষুদ্রতম অংশই বাস্তবের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ ঘটায়। দ্বিতীয় স্তর হল অবচেতন মন; এটি আগে চেতন ছিল আর এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। একটু চেষ্টা করলেই অনেক সময় অবচেতন মনকে চেতন স্তরে তুলে আনা যায়। যেমন—স্মৃতিচারণার মাধ্যমে অতীতের কোনো বিষয়কে চেতন স্তরে তুলে ধরা যেতে পারে অনায়াসেই। তৃতীয় স্তরটি অচেতন মন—এটি মনের বৃহত্তম অংশ। একটি রেখা চিত্রের সাহায্যে মনের বিমূর্ত ধারণাটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন ফ্রয়েড। এতে অদস্-অহং-অধিশাস্তা আর চেতন-অচেতন-অবচেতন—দুটি কৌণিকতা থেকেই মনকে বোঝানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—

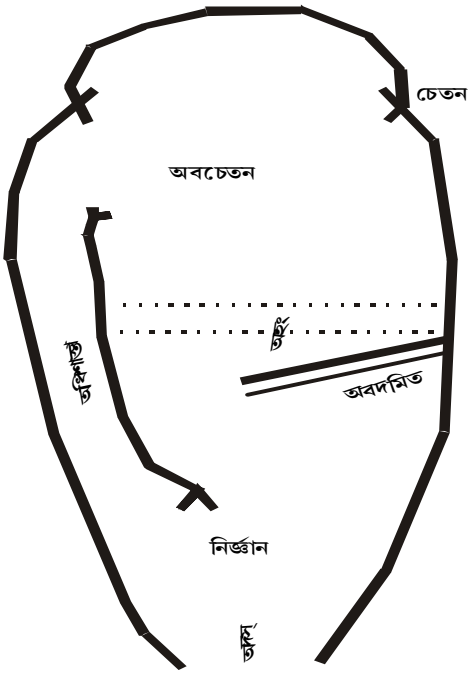

মনকে এইভাবে রেখাচিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেও ফ্রয়েড নিজেই সন্দিগ্ধ ছিলেন যে এভাবে একটি বায়বীয় সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা কতটা যুক্তিযুক্ত। তবুও এই রেখাচিত্র একটি বিমূর্ত ভাবনাকে প্রত্যক্ষীভূত রূপ দিয়েছে। অদসের পুরোটাই নির্জ্ঞান। যা কিছুই অবদমিত সবই এই নির্জ্ঞানে চলে যায়। অহং-এর কিছুটা নির্জ্ঞানে আর বাকীটা অবচেতনে। শিশুর অবদমিত আকাঙ্ক্ষা যখন নৈতিকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনি সেটা অধিশাস্তা। এই অধিশাস্তাও নির্জ্ঞান পর্যন্ত তলিয়ে আছে। উত্তরকালে মানবমনের এই চেতন-অবচেতন আর অচেতন

স্তরকে শতাংশের নিরীখেও প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। চেতনস্তর ১০ শতাংশ, অবচেতন স্তর ৫০-৬০ শতাংশ আর অচেতন স্তর ৩০-৪০ শতাংশ। এই স্তর পরম্পরার একটি বিশেষ মননগত দিক হল স্বপ্ন। ফ্রয়েডীয় ভাবনায় এই স্বপ্ন আমাদের অবচেতন মনজাত। চেতন মনের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতা আর নৈতিকতার কারণে পূরণ হয় না। সেইসব অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা অবচেতন স্তরে সঞ্চিত থাকে। চেতন ও অচেতনের মধ্যবর্তী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অবচেতন মনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে সেই অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নময় রূপ লাভ করে একটা কাল্পনিক বাস্তবতা পায়। ফ্রয়েড বলেছেন, স্বপ্ন হল মূলত অবচেতন আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতীকী পরিতৃপ্তি। ফ্রয়েডের এই ভাবনাকে ভাষ্যরূপ দিয়ে ড. তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন—''... স্বপ্নের বস্তুভিত্তি যদি সরাসরি প্রকাশিত হত, তাহলে তা হয়তো আমাদের প্রবল অস্বস্তি এবং আশংকার কারণ হত। কেননা জাগ্রত অবস্থায় সচেতন মনে সেইসব আমরা হয়তো ভাবতেও পারি না। আক্ষরিক অর্থেই ঘুমোতে পারতাম না তখন। যাতে আমরা অশান্ত না হই, বিশ্রামের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত না হই—অবচেতন আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে নানা ছদ্মবেশের আড়ালে গোপন করে রাখে, বদলে দেয়, কোমল ও সহনীয় করে তোলে। ঐসব আকাঙ্ক্ষার বস্তুভিত্তির ওপর পর্দা নেমে আসে, তাদের প্রকৃত নিষ্কর্ষ রূপান্তরিত বা বিকৃত হয়ে যায়। অবচেতনের এইসব ক্রিয়াই স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্ত হয়। সেই স্বপ্ন রাজ্যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নানা ধরণের প্রতীকে রূপান্তরিত হয় বলে এদের ভাষ্য করতে না পারলে তাৎপর্য অধরা রয়ে যায়।"[৪] বস্তুত অহং প্রহরীর ভূমিকায় স্বপ্নেও থাকে। কখনো এলোমেলো বার্তা পৌঁছে দেয় আবার কখনো বা রূপকল্পদের পরিশোধন করে। এইসব আলোচনার নিরীখে আপাতদৃষ্টিতে ফ্রয়েডকে যুক্তিবাদী মনে হয় না, কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় তিনি শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে যুক্তি ও অভিজ্ঞতা অপ্রতিরোধ্য। এরই প্রেক্ষিতে ড. ভট্টাচার্য আরও জানিয়েছেন—''...মানুষের ক্ষমতার ওপর তাঁর (ফ্রয়েড) আস্থা ছিল, যদিও সাধারণভাবে তাঁর চিন্তাধারা রক্ষণশীল ও নৈরাশ্যবাদী, কেননা অন্তিম পর্যায়ের রচনায় তিনি এই বোধে পৌঁছেছিলেন যে, সমগ্র মানবজাতি এক ভয়ংকর মৃত্যু এষণায় বন্দী। জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মৃত্যু; তা এমন আনন্দময় প্রাণাতীত অবস্থা যেখানে অহং আহত হয় না।"[৫] আসলে ফ্রয়েড মানুষের সহজাত আদিম প্রবৃত্তিকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—প্রাণশক্তি বা জীবনবৃত্তি এবং বিনাশশক্তি বা মরণবৃত্তি। প্রাণী মাত্রেরই

যেমন বাঁচার প্রবল ইচ্ছা আছে, তেমনি জীবনের বিশেষ পরিস্থিতি তাকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে যায়। জীবনবৃত্তি প্রকাশ পায় আত্ম ও জাতি সংরক্ষণ আর আত্ম প্রচারের মধ্যে। সবাই বলে শুধু আমাকেই দেখো আর 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম'। তেমনি বিনাশবৃত্তি মানুষকে আত্ম নির্যাতন, আত্মহনন আর নিষ্ঠুরতায় উদ্বুদ্ধ করে। জীবনের এই স্ববিরোধিতা অনিবার্য। বিশেষ করে সংবেদনশীল মানুষের এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের সীমাবদ্ধতা যাই থাক না কেন, এই চিন্তা চেতনার প্রভাব শিল্প-সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই মনঃসমীক্ষণের একটি বিশেষ দিক যে যৌনতা, সাহিত্যিক এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হয়েছেন। আদি রসাত্মক সাহিত্যের প্রাচীন যে ধারা ছিল তার সঙ্গে এই সাহিত্য ধারার অনিবার্য পার্থক্য তৈরী হয়ে গেছে। যৌনতা ও সাহিত্যের এই দিকটি ব্যাখা করে ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—''...মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যৌন আকাঙ্ক্ষা মানব মনের মূলপ্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত হল। সাহিত্যে যৌন আকর্ষণ একটি স্বতন্ত্র সাময়িক উত্তেজনার ঘটনা হিসেবে বিশ্লেষিত না হয়ে মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিকোণ দিয়ে মানব মনের মূল প্রেরণার সঙ্গে এর সম্পর্কটি বিচার করায় বিষয়টি ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত লাভ করল।''[৬] কেবল যৌনতা নয় সাহিত্যে মৃত্যুচিন্তা, হত্যা, আত্মহত্যার ঘটনা, পাগলামী বা মানসিক বিকৃতি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ এক নূতন দরজা খুলে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এই মনঃসমীক্ষণের আলো প্রথম বিচ্ছুরিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষ করে সামাজিক উপন্যাসে। 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) উপন্যাসে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনী-দেবেন্দ্র-হীরা প্রভৃতি চরিত্রগুলি এই মনঃসমীক্ষণের যথার্থ ফসল। চরিত্রগুলি কখনো তাদের কথনে আবার কখনো তাদের লিখিত চিঠিপত্রে তাদের মনের গোপন চাওয়া-পাওয়াগুলি ব্যক্ত করেছে। সেইসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে লেখকের মানসিকতা এবং উপন্যাসের পরিণতিতে পৌঁছে আমরা বুঝতে পারি লেখক তাঁর শিল্পী মানসিকতাকে কণ্ঠরোধ করে কীভাবে নীতিবাগিশ মানসিকতাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। একই পরিণতি ঘটেছে তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসেও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যে নবত্ব', 'আধুনিক কাব্য' ইত্যাদি রচনার মধ্যদিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যের 'সস্তা কারি পাউডার' কীভাবে কল্লোলীয়রা সাহিত্যে এনেছেন বলে সমালোচনা করলেও তিনিও স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন, আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ ঘটনা পরম্পরা নয়, চরিত্রদের 'আঁতের কথা' বের করে দেওয়ার

মধ্যদিয়েই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখানেই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ অনায়াসেই স্থান করে নিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে যথার্থই লিখেছেন—''এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে। ... সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।''[৭] এরই পরিপ্রেক্ষিতে কল্লোলীয়দের চেয়ে কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ জগদীশগুপ্ত সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছিলেন এই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণকে আত্মস্থ করে। তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বলয়কে চিহ্নিত করে সমালোচক ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—''বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কেন্দ্রে জগদীশ গুপ্ত কখনও স্থান গ্রহণ করেননি। শরৎচন্দ্রের গার্হস্থ্যধর্মী গল্পের ঐতিহ্য মনের কোন কোন স্তরে কিঞ্চিৎ বজায় থাকাটাই হয়ত এর কারণ। ফ্রয়েড এবং কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পাঠ করেও তিনি নিজস্ব রচনা ধারা গড়ে তোলেননি।''[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শ ত্যাগ করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে—এই উপলব্ধিটাই জগদীশ গুপ্তকে তাড়িত করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর কুষ্ঠিয়ার গ্রামীণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর আদালতে টাইপিষ্টের কর্মসূত্রে যে মানুষগুলোকে তিনি প্রতিদিন চুলচেরা লাভালাভের পঙ্কিলতায় ডুবে থাকতে দেখতেন সেই মানুষের জীবনই তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের আলোকে তিনি বিচিত্র স্বভাবের মানুষগুলোর মনোলোকের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং তুলে এনেছেন তাদের চরিত্রের নানা কৌণিকতাকে। বস্তুতঃ জগদীশবাবু তাঁর অভিজ্ঞতা লব্ধ জগৎ থেকে অদস্-অহং-অধিশাস্তার মধ্যে মূলত অদস্ এর অধীন মানুষগুলোকে খুব বেশী করে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে অসৎ লোভী, ঠক, আত্মকেন্দ্রিক, পরশ্রীকাতর, নিতান্ত দেহসর্বস্ব মানুষগুলো তাঁর গল্প-উপন্যাসে বেশী ভিড় করেছে। মানুষের মধ্যে শুভবোধের অভাব, হিংসা জর্জরিত কুটিল বিসর্পিল স্বভাবের মানুষগুলির জীবন তিনি তুলে এনে যেন অন্ধকারকেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যরুচির, নির্মল স্নিগ্ধ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থই লিখেছেন—''...রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যেখানে মানুষের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল কথাই হলো মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস।''[৯]

এই সূত্রেই উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনোজগতের কুটিল ও বিসর্পিলতাকে তিনি পরিস্ফুট করেছেন।

মানুষের ভেতরে শঠতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা যে কোন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে সেটা লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক নটবর ওরফে সিদ্ধার্থ ভেতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তার বাহ্যিক সৌম্যকান্তি চেহারার অন্তরালে একটা কুৎসিত মানুষ যে বসবাস করত তাকে লেখক অত্যন্ত সুকৌশলে পরিস্ফুট করেছেন। চরিত্রটির বাইরের স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—''সিদ্ধার্থের ঋজু বলিষ্ঠ দেহ; বর্ণ গৌর; মুখে বুদ্ধির দীপ্তি; এমনি করিয়া সে মাটিতে পা ফেলিয়া চলে যেন পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিকূলতা আর বিমুখতা সে অতীব অবজ্ঞার সহিত দু'পা দিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছে; মানুষের সঙ্গ দিয়া তার কোনো প্রয়োজন নাই; সহানুভূতির ধার সে ধারে না।''[১০] এই তার বাহ্য মূর্তি কিন্তু ভেতরটা তার অন্যরকম। কিছুদিন ধরে সেখানে অগ্নিগিরির অগ্নিবমন শুরু হয়ে গেছে। বাইরে সপ্রতিভ হলেও ভেতরে সে শ্রান্ত, পরামুখাপেক্ষী চরিত্র। এই পরামুখাপেক্ষিতার সাথে লেখক দীপের চঞ্চল শিখা আর তার সমগ্র মানসিক সত্তার সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা করেছেন। বন্ধু দেবরাজের ডান হাতখানা বুকের ওপর টেনে সে অন্ধকার দেখিয়েছে। বন্ধুকে বুকে কান পেতে থাকতে বলেছে। সেখানে ভগবানের অভিশাপ চেপে বসে আছে আর ভেতর থেকে প্রতিনিয়ত উঠছে 'ক্ষুধার গোঙানি'। ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধার্থ ছদ্মনামের আড়ালে নটবর একজন বৈষ্ণবীর গর্ভে কোনো এক ব্রাহ্মণের জারজ সন্তান সে। জীবনের প্রথম লগ্নে সে ছিল দোকানের বিনা মাইনের চাকর। তারপর সখের থিয়েটারের ছোকরা অভিনেতা এখন অর্থের বিনিময়ে এক বৃদ্ধার শয্যাসঙ্গী। এই বেড়ে ওঠার কলুষ জর্জর পরিবেশ নটবরের অন্তরটাকে মুক্ত হতে দেয়নি। তার মনের যাবতীয় টানাপোড়েনের কারণে যখন সে অবচেতনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অস্থির, তখনই প্রস্তাব আসে জাল করে অর্থ সংগ্রহ করার। প্রস্তাব শুনে তার বাহ্য আচরণকে দেবরাজের মনে হয়েছে নিপুণ অভিনয়। শেষপর্যন্ত দেনার দায়ে জর্জরিত নটবর তমলুক জাল করার প্রস্তাবে রাজী হয় কিন্তু তার অন্তরে গভীর মনস্তাপের সৃষ্টি হয়। জীবনের সূচনা লগ্নেই যার শুভভাবনার সবরকম সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছিল এবং তার জীবন একটা ফলহীন বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে জড়িয়ে উত্তরণের পথ হারিয়ে ফেলে ছিল। অথচ এই সিদ্ধার্থ গৃহী নয়, কেননা তার কোনো গৃহ নেই,

সে বৈরাগী নয়, কারণ তার কোনো বৈরাগ্য জমে নি। এই দুইয়ের মাঝখানে সে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলেছে। তার এই ব্যর্থতা, বিরহ আর শূন্যতা কেবল সমব্যথীরাই অনুভব করতে পারবে। এহেন চরিত্রটিই সম্পর্কে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—''জগদীশ গুপ্ত সিদ্ধার্থের মানস-জগৎ বিশ্লেষণ দুর্বলতার ফাঁক আবিস্কারে সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের এই দুর্বলতার জন্য বাস্তব পৃথিবীতে চলবার স্বাভাবিক মাত্রাজ্ঞান সে রক্ষা করতে পারেনি। ফলে সহজেই প্রবঞ্চক ইতরে পরিণত হয়েছে।''[১১] আসলে সচেতন অংশে চরিত্রটির অহংসত্তা অগ্রসর হয়ে বাস্তব পরিস্থিতিতে যেতে চাইছে কিন্তু অচেতন বা নির্জ্ঞান অংশের পিছুটানের জন্যে সে যেতে পারেনি বলেই তার অন্তর বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

সিদ্ধার্থর অপরাধবোধ থেকে যে মানসিক যন্ত্রণার সূত্রপাত তার থেকে মুক্তির জন্য সে একসময় আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে সফল হয় না। মৃত্যুর কাছাকাছি এসেও সে জীবনের এমন এক আশ্চর্য রূপের সন্ধান পায় যার জন্যে তার মনে হয় 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। তার এই মানসিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—''যাহাকে দর্শন মাত্রেই সিদ্ধার্থ ডিগবাজি খাইয়া মরণের তট হইতে জীবনের জ্যোতির্মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বলা বাহুল্য সে একটি নারী। প্রপাতের অদূরে যে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহাকে দেখিয়াই সিদ্ধার্থর মরিবার সংকল্প উল্টাইয়া সরাসরি একটা সহজ বুদ্ধির উদয় হইল।''[১২] অস্থির জলের নীচে ক্ষুধা তৃষ্ণা আর বিবেক দংশনের পরম শান্তি যেন মিলনাকুলা প্রেয়সীর মতো সিদ্ধার্থকে গ্রহণ করতে বাহু মেলে বুক পেতে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই মৃত্যু প্রেয়সীর স্থানে এল অজয়া। এই অজয়াকে ঘিরে সিদ্ধার্থের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষাটি একান্তভাবে সৎ। এই অজয়ার মধ্যে সে একটি পরিপূর্ণ নারীর সন্ধান পেয়েছে। এবং এই নারীর চোখের সামনে নিজেকে স্পষ্টভাবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। কারণ তার বিশ্বাস অজয়ার প্রেমেই তার জীবনের যাবতীয় গ্লানি ও বেদনা দূর হয়ে যাবে। এই ভাবনার মধ্যে হয়তো কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। যেভাবে গণিকা উত্তম একদিন গৃহী নারী হতে চেয়েছে। সিদ্ধার্থর মধ্যে যে ভণ্ডামি এবং শঠতার অভিযোগ তা আসলে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উপায়হীন সংগ্রাম। যে অপরাধপ্রবণ মানসিকতার ফলে নীচ বিষয়ে মানুষ আনন্দ লাভ করে সেই প্রকৃতি সিদ্ধার্থর মধ্যে নেই। তার অহং শক্তি দুর্বল হওয়ায় সে এমন ঘটনা

ঘটিয়েছে। স্বভাবতই তার মনে হয়েছে, জীবনের অন্তহীন ধারা একটিমাত্র স্তবকে সীমাবদ্ধ হয়ে একটি রেখার সামনে গতিহীন হয়ে পড়েছে। এই রেখাটি উত্তীর্ণ হতে সিদ্ধার্থর মন কিছুতেই চাইল না। তবে তার এই মানসিক পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বলে মানতে চাননি সমালোচক ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন—''... একদিকে জীবনের তীব্র ব্যর্থতার মধ্যে বাঁচবার সান্ত্বনায় উল্লাস, আর একদিকে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তির নারীসঙ্গ লিপ্সায় চাতুর্যের উদয়। এই পরিবর্তন উপন্যাসটির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। সিদ্ধার্থের এ পরিবর্তনের পূর্বসূত্র হিসেবে এমন কোন প্রস্তুতি লেখক সৃষ্টি করেন নি যা অনুসরণ করে আমরা পরিবর্তিত সিদ্ধার্থের কার্যকলাপে সায় দিতে পারি।''[১৩] এই সীমাবদ্ধতার দিকটি বাদ দিলে লেখকের আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল এমন বোধহয় বলা যাবে না। আসলে আগের সিদ্ধার্থ এবং পরের সিদ্ধার্থ—এই পৃথক সত্তা দুটির মাঝের সেতুটি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। তবে অজয়ার মানসিক দিকটির উদ্‌ঘাটনে লেখকের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থের মানসিক পরিবর্তনের দিকটি মেনে নিলে দেখা যায় অজয়ার কাছে নিজেকে স্পষ্টভাবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত সে এই কারণে নিয়েছে যে, তার বিশ্বাস অজয়ার প্রেমেই তার জীবনের যাবতীয় গ্লানি দূর হয়ে যাবে। আসলে অতিশয় হীন সংশ্রবে জীবনের দীর্ঘদিন সে কাটিয়েছে, 'তাই তার আহৃত শিক্ষার ফলটিকে আবৃত করিয়া মাঝে মাঝে পাঁকের বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতে থাকে।' কিন্তু নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে নিজের কাছেই সে বারবার ধরা পড়ে গেছে। সেই সঙ্গে তার পিসিমা ও ভাই রজতের কথাতেও সন্দেহের কালো মেঘ জমে ওঠে। এরই সঙ্গে মানুষের মনের অচেতন অংশের সহজাত প্রবৃতি ক্ষমতা তার বাস্তবতাবোধ থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী; কাজেই অনেক সময় নৈতিকবোধকে অস্বীকার করে সহজাত প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। জগদীশবাবু সিদ্ধার্থ চরিত্রের এই সহজাত প্রবৃত্তির দিকটি তুলে ধরলেও সেটাকে মানুষের বিগত অভ্যাস বলেই ছেদ টেনেছেন। আসলে সিদ্ধার্থের অতীত জীবন অভিজ্ঞতা আর তার হীন মানসিকতা —এই দুটো মিলে তার পরিণতি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। কাহিনীর চূড়ান্ত পর্বে এসে প্রকৃত সিদ্ধার্থের মাতামহ কাশীনাথ ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থকে দেখে অজয়াকে প্রশ্ন করে নিজের বক্তব্য জানিয়েছে। এই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে লেখক ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থ আর অজয়ার অন্তর্গত মননকে তুলে ধরেছেন—

''কাশীনাথ বলিলেন, 'সিদ্ধার্থকে তুমি খুব ভালবাস?

বলো, লজ্জা কি? আমি যে তোমার দাদা মশাই'।

বৃদ্ধের যেন কিছুরই দিশা নাই। অজয়া নিরুত্তরে মাথা নত করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ হাত চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থর যে আর একদণ্ড পরমায়ু, সে যে বাঁচবে না।

অজয়া চমকিয়া উঠিল, সেকি? কি বলছেন আপনি?

হঠাৎ অজয়া বৃদ্ধকে পাগল ঠাওরাইয়া বসিল।"[১৪]

ইতিপূর্বেই সিদ্ধার্থের অন্তর্দাহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত সিদ্ধার্থের ছায়া তাকে তাড়িত করেছে। সে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে শ্মশানে চিতা জ্বলছে। চিতার আগুনে ধোঁয়া নেই। চিতায় শায়িত শবদেহটা দেখা যাচ্ছে। নকল সিদ্ধার্থের সামনে আসল সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়িয়েছে। নকল সগর্বে ঘোষণা করেছে অজয়ার সঙ্গে তার বিবাহের কথা। অজয়াকে ছায়া হাত তুলে নিষেধ করেছে, নকল সিদ্ধার্থকে ভালো না বাসার কথা বলেছে। কেননা সে আসল সিদ্ধার্থের গল্পটা চুরি করে বেঁচে আছে। সে আসলে জারজ সন্তান অর্থলোভে কুরূপা বৃদ্ধা বারাঙ্গনার সেবা করত। এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন কাশীনাথ। এই পরিচয় পেয়ে অজয়ার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেতে নিলে রজত তাকে ধরে ফেলে। কাশীনাথ নকল সিদ্ধার্থকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন—''তুই কেন এ কাজ করলি? কেন তুই মানুষের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছিস্? বল সিদ্ধার্থ কোথায়? তার নাম আর পরিচয় তুই কোথায় পেলি?"[১৫] মুখোশ খুলে গেলে মানুষের ভেতরের কংকালটা বেরিয়ে পড়ে। তখন তার আর বাঁচার কোনো পথ থাকে না। ফলে প্রবঞ্চক নটবর স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করে গেলে আর কোনো উত্তর দেয়নি। নিজের পক্ষে সে যুক্তি সাজিয়ে রজতকে অসংকোচে জানিয়ে যায়—''... ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসে ছিলাম। ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত' সেই মানুষ।"[১৬] তার কাছ থেকেই জানা যায় প্রকৃত সিদ্ধার্থ আর বেঁচে নেই। সিদ্ধার্থ এইভাবে নটবরের বেশ থেকে বেরিয়ে এসে যা কিছু করেছে তার মূলে ছিল তার অদস্ -এর প্রভাব। তার পুরো অতীত জীবনটাই একটা গ্লানি ও পঙ্কের মজা পুকুর—যার ভেতরে নামলে কুটিলতা আর বিসর্পিনতাই ধরা পড়ে। তবে লেখক সিদ্ধার্থের ভালো মানুষী সত্তাটির সঙ্গে তার শঠ সত্তাটির সবক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটাতে পারেননি বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। আসলে মানুষ নিজে

যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করার প্রাণান্তকর প্রয়াস প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই থাকে—এই ভাবনার কেন্দ্রে এসে সিদ্ধার্থ নামক মানুষটির মানস কুটিলতা জটিলতাকে সমর্থন করা যায়। এই দ্বৈত সত্তার মূল্যায়ন করে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান যথার্থই লিখেছেন—''...সিদ্ধার্থর হতাশা ও বিরক্তি এবং সীমাহীন ক্লান্তিকে একদিক থেকে যেমন বিশ্বব্যাপী কুশ্রিতা অবিচ্ছিন্নভাবে পেঁচিয়ে আছে, তেমনি সংগোপনে খনির গর্ভে লুক্কায়িত হীরকের মতো সমস্ত তিক্ত প্রত্যাখ্যান ও অসহায় আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও ভালোবাসা নামক স্পন্দিত সজীব হৃৎপিণ্ডকে আমাদের আবিস্কার করে নিতে কষ্ট হয় না।''[১৭]

জগদীশবাবু তাঁর 'পয়োমুখম্' গল্পে দেখিয়েছেন কেমন করে পিতার অর্থ লোলুপতার কারণে একের পর এক পুত্রবধূর মৃত্যু হয়। পণের মোটা টাকার লোভে ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা পুত্রবধূদের ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলত এবং পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিত। শেষ বউটির বেলায় ভূতনাথের কাছে পিতার অর্থলোলুপতা ও অমানবিক স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিতাকে সে ব্যঙ্গের হাসি হেসে জানিয়ে দেয়—''এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরলো না বাবা। পারেন তো নিজেই খেয়ে ফেলুন।''[১৮] পিতার এই অর্থ লোলুপতারই এক নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়েছে 'মহিষী' উপন্যাসে। পুত্রের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা না থাকায় পিতা ব্রজকিশোর মোটা টাকা পণ নিয়ে কালো মেয়ের সঙ্গে পুত্র অশোকের বিয়ে দেন। আলালের ঘরের দুলাল আর রূপবান বলে বন্ধুদের কাছে অশোকের পরিচয় ছিল 'যুবরাজ' রূপে। বন্ধু মারফত অশোক পিতার কাছে পাত্রী দেখার প্রস্তাব পাঠিয়ে ব্যর্থ হয়। এনিয়ে পুত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে অশোক আর পিতার সঙ্গে বিরোধে যায় নি। কালো মেয়েকেই সে স্ত্রী হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু পিতার গোপন অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়লে অশোকের সমস্ত রাগ-বিদ্বেষ পিতার দিকে ধাবিত না হতে পেরে স্ত্রী জ্যোতির্ময়ীর উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়। এই দূরত্ব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তৃতীয় নারীর অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং তাদের চির-বিচ্ছেদ ঘটে।

অশোকের পিতার মধ্যে পুনস্নেহের লেশমাত্র নেই। তিনি মূলত অদস্ তাড়িত। সুখ ভোগাকাঙ্ক্ষাই তার কাছে শেষ কথা। এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তিনি পুত্র অশোককে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ব্রজকিশোরের মধ্যে কোনো শুভবোধ ছিল না। তারই উত্তরসূরী হিসেবে অশোকের মধ্যে লেখক দুটি পৃথক সত্তাকে প্রকটিত করেছেন। তার

বাহ্য সুন্দর রূপের বিপরীতে অন্তরে একেবারে কুৎসিত রূপ। এদিক থেকে তাকে অনায়াসেই মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তার বাহ্য রূপের বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন—

''...আমাদের যুবরাজ ঐ ব্রজ কিশোরের পুত্র—

অশোক সুপুরুষ বর্ণ গৌর, দেহ সুগঠিত সবল; মোটের উপর এমন একটা অভিজাতশ্রী আর গাম্ভীর্য তার আছে যা সুলভ নয়। অশোকের যুবরাজ নাম পাইবার ঐ একটা কারণ।''[১৯]

আপাত এই বাহ্য চেহারার অন্তরালে অশোক আসলে গাঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন নয় এবং তার আত্ম নির্ভরশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে বলার সাহস পায়নি যে, 'আমি ক'রব বিয়ে, যাকে বিয়ে ক'রব তাকে আমি স্বচক্ষে দেখে নেব'। এই ঘটনায় তার অহং আর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার দ্বন্দ্ব সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে পিতা তাকে বিষ্ণুপুরের সুন্দরী মেয়ের পরিবর্তে বাতাসপুর নিবাসী মন্মথ রায়ের কালো কন্যার সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধিয়েছে। পিতার এহেন কপটতায় অশোকের প্রাণের রং মুছে গেল। বিয়ে এবং স্ত্রী লাভ—এই দুটো ব্যাপারকে সে একটা দুর্লভ, লাভের সমাদর এবং মূল্য দিয়েছিল। কিন্তু তার সেই মূল্যে 'জুয়াচুরি' আছে শুনেই সেই মূল্যটির অঙ্ক গোলাকার একটি শূন্যে পরিণত হয়ে তার চোখের সামনে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। পিতার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পেরে নিজের দুর্বলতার জন্য তার ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করেছে এবং এর শাস্তি হিসেবে সে নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানিয়েছে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে তুলে দেবার ক্ষেত্রে অশোক এক কুটিল চরিত্রের মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। কালো স্ত্রীর প্রতি অবিচার করার যুক্তি সে অনায়াসেই খুঁজে পেয়েছে—এ এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি। প্রসঙ্গত লেখক জানিয়েছেন—''অশোক তার মানসিক ব্যাধির এই ব্যবস্থা করিল যে, লজ্জা ঢাকিতে নয়, আত্মসম্মান বজায় রাখিতে বাহিরের লোকের কাছে এই ভাবটাই দেখাইতে হইবে, সম্পত্তির লোভে বাবা কালো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন বটে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিকে নস্যাৎ করিতে যদি স্ত্রীকে অসমাদার করিতে হয় তবে তাহাতেও সে পশ্চাদপদ হইবে না।...''[২০]

এখানে তার অন্তর্গত অদস্ সত্তাটিরই জয় ঘোষিত হয়েছে। অহংকে দূরে সরিয়ে রেখে সে এমনটাও ভাবতে কুণ্ঠিত হয়নি যে 'তার এই লাঞ্ছনার জন্য কেহ দায়ী নহে, বাবা নন, গগন নয়, মধু খুড়ো নন, মা নন দায়ী ঐ স্ত্রীটি'। এইভাবে পঙ্কিলতার অবগাহন করার শেষধাপ সে নেমে গেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বন্ধুদের কাছে অশালীন অভিযোগ করে—''কালো বউ আরো

আছে। কিন্তু এ একেবারে।... প্রবৃত্তি বড় জঘন্য, আর ঘেন্না বলে কোনো আবরণ তার নেই। হস্তিনী নারীর সব লক্ষণ তাতে বিদ্যামান।"[২১] স্ত্রীর অবর্তমানে স্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন অপবাদ দিলেও জ্যোতির্ময়ী কিন্তু তার প্রবল অহং দ্বারা চালিত হয়েছে। পিতার কাছে স্বামীর বিষয়ে এমন কথা শুনে সে অনুমান করেছে, কোথাও একটু ভুল হচ্ছে হয়তো। এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে সে বাপের বাড়ী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী ফিরে আসে। কিন্তু স্বামী তাকে আর কোনোভাবেই গ্রহণ করেনি। একদিকে অদস্-এ আচ্ছন্ন অশোক আর প্রবল আত্মাভিমানী জ্যোতির্ময়ীর বিছানা নিশ্চিত ভাবেই আলাদা হয়ে গেছে। 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী যেভাবে স্বামীর সঙ্গে সহাবস্থানে যেতে পারে নি। জ্যোতি বুঝতে পেরেছে, সে কালো বলেই স্বামী তাকে গ্রহণ করেনি। এবিষয়ে তার নিজেরও আগে থেকেই একটা হীনমন্যতাবোধ ছিল। তবে স্বামী তাকে প্রথম পর্বে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার তার এই দুর্বলতা কেটে গিয়েছিল। তবে দ্বিতীয়বার যখন সে আঘাতটা পেল, ততদিনে তার মধ্যে জীবন সম্পর্কে যে ইতিবাচক ভাবনা ছিল সেটা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। জ্যোতির ভেতরে যে সুস্থ জীবনবোধ ছিল সেকথা লেখক তার মনের অতলস্তরের চিত্র তুলে ধরে স্পষ্ট করেছেন। সর্বান্তকরণ দিয়ে ধ্যান ক'রে সে ভবিষ্যতের একটি সুরঞ্জিত মনোরম ছায়াচিত্র গড়ে তুলেছে, যা হাসিতে উজ্জ্বল, অর্চনায় পবিত্র, প্রেমে মধুর; যাতে কপটতা নেই, তিক্ততা নেই, ব্যসন নইে। লেখকের ভাষায়—''মন তার আরো দূরে ভ্রমণ করে—যেখানে সে সন্তানের জননী—পুত্র-কন্যার ভেদ জ্ঞান নাই... কেবল প্রাণ মুকুলটি কোলে ন্যস্ত—শৈশবের সেই অভিনয়টুকু যেন নিত্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—পুতুলটি প্রাণ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও সে জানে না সে-ই তার মা।"...[২২]

বস্তুতঃ জ্যোতির্ময়ী বুঝেছিল স্বামী অশোক তাকে মোটেই ভালোবাসে না। তখন তার কালো রংয়ের জন্য হীনমণ্যতা বোধের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে একটা প্রবল জেদ। এবং স্বামীর কবল থেকে সে যেকোন মূল্যে মুক্ত হতে চায়। অশোক তাকে শারীরিকভাবে লাভ করতে চাইলে জ্যোতি স্পষ্ট করে দিয়েছে, ভালোবাসাহীন দৈহিক সম্পর্ক সে চায় না। এই দেহজ সুখ যাতে অশোক পায় সেজন্য মূলতঃ তারই অনুরোধে ব্রজকিশোর ও রত্নময়ী পুনরায় অশোকের বিবাহে উদ্যোগী হন। স্বামীকে সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে—''শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে সে তোমার বৃথা আশা। ... তুমি যে ত্যাগ

করেছিলে, সেইটেই সত্যি। মাকে বলেছি—ক'নে দেখতে।"[২৩] অহংবোধ জ্যোতির্ময়ীকে এভাবে শরীর সর্বস্ব অশোকের কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। চিরতরে বাপের বাড়ী চলে যাবার আগে জ্যোতি দেখেছিল, অশোকের মন রূপ সাগরে ডুবে গেছে। নতুন শরীর পেয়ে স্বামীর চেহারাই বদলে গেছে চোখে-মুখে আনন্দ ধারা উছ্‌লে উঠেছে। বিধাতা তাকে ছুটি দিয়েছেন। শরীরের ব্যাকরণ শরীর গ্রহণের মধ্যদিয়েই তৃপ্তি খুঁজেছে আর জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গ।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎ থেকে অদস্-অহং আর অধিশাস্তা সমন্বিত যে মানুষ তাদের মনোজগতে অদসে্রই বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করেছিলেন। তবে অহং আর অধিশাস্তা সমন্বিত মানুষও তাঁর রচনায় এসেছে। আদালতের কর্মসূত্রে তিনি স্বার্থপর নগ্ন-লোভী মুখোশহীন মানুষদের সঙ্গেই বেশী পরিচিত ছিলেন। স্বভাবই তাঁর গল্প উপন্যাসে মানুষের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল রূপই অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ভাবনার বিশিষ্ট উপন্যাস 'লঘুগুরু'। আধুনিক জীবন জটিলতার কারণে মানুষের ভেতর আর বাইরের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরী হয়ে গেছে। সেই দ্বৈতসত্তার মানুষদের মধ্যেকার অন্ধকার দিকটি তাঁকে অধিক আকর্ষণ করেছে। ফলে এই উপন্যাসে আমরা দেখি সেইসব ভোগসর্বস্ব মানুষের কদর্য জীবন যাপন। যাদের বেশীরভাগেরই কোনো উত্তরণ নেই। একসময়ের যূথী থেকে বনমালা হয়ে গণিকা উত্তম বহু পুরুষচারিণী থেকে গৃহী জীবনে প্রবেশের ইচ্ছা পোষণ করে। বিপত্নীক বিশ্বম্ভরের হাত ধরে সে সংসারে আসে এবং টুকীর মা হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বয়ং বিশ্বম্ভর ও প্রতিবেশীরা সেইসঙ্গে বিশ্বম্ভরের বন্ধুরা—সকলে মিলে উত্তমের জীবন থেকে তার পূর্ব পরিচয় মুছে ফেলতে দিতে নারাজ। ফলে উত্তমের হাতে মানুষ হয়েও টুকীর স্বাভাবিক বিয়ে হয় না। বিপত্নীক ও গণিকা পরিবৃত সংসারে টুকী যায় এবং অল্পকালের মধ্যে পুনরায় দেহব্যবসার পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়। ফলে একদা পাপের পথে নেমে যেতে হয়েছিল সে উত্তমকে তার আর সংসারে ফেরা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে অদস্ স্তরের মানুষ বলেই মনে হয় কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, তাদের ভেতরেও অনেকের মধ্যেই নৈতিকতা ও বিবেকবোধ ছিল।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উত্তম সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে গণিকা জীবন বেছে নেয়। তার পঙ্কিল ভোগ সর্বস্বতার কোনো পৃঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় লেখক তুলে ধরেননি।

ফলে উত্তমের ভেতরের ভোগাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়ে কীভাবে সুস্থ যাপনাকাঙ্ক্ষা প্রকট হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। যেখানে এই অস্পষ্টতা সেটাকে রবীন্দ্রনাথ মানতে পারেননি। সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি উত্তমের মানসিকতার পরিবর্তনকে তার স্বাভাবিক মনে হয়নি। এবিষয়ে তিনি সমালোচনা করে লিখেছিলেন—''পতনের ইতিহাসটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখলে মনে হয় যে পতিতা নারীর মধ্যেও সতীত্বের উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এই তত্ত্বটাকে একটা চমক লাগানো অলঙ্কারের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে। সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণ বাহুল্যে অতিমাত্রায় রাঙ্গিয়ে তোলার যত বড় অবাস্তবতা, লোকে সেটাকে অসাধু বলে তাকে সেন্টিমেন্টের রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা বেশি বই কম হয় না।''[২৪] উত্তমের এই মানসিক পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজেই তাঁর 'পতিতা' কবিতায় বারাঙ্গনা নারীর মধ্যে প্রেম চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। অঙ্গরাজ্যের সংকটের সময় অপাপবিদ্ধ কুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। কিন্তু সেই বারাঙ্গনার মধ্যে প্রেমচেতনা জাগ্রহ হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে এসে। তখন সেই বারাঙ্গনা রাজমন্ত্রীর কাছে যাবতীয় স্বর্ণমুদ্রার পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে এসেছে—

''ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী, চরণপদ্মে নমস্কার।
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা, লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে পাঠাইলে বনে যে কয়জনা।
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে আমি আমি এক বারাঙ্গনা।''[২৫]

আর জগদীশবাবুর জীবনেও এমন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাঁর শৈশবে। আসলে উত্তমের ভেতরের গৃহী ও মাতৃসত্তা তাকে পুরোপুরি 'অদস্' স্তরে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। তার ভেতরে অহং-এর প্রকাশ ঘটেছিল অচিরেই। তবে উত্তমের মনোলোক উদ্‌ঘাটনে তার পূর্ব জীবনের পরিচয় বিস্তারিত দিলে ভালো হত—এমনটা অনেকেই মনে করেছেন।

গার্হস্থ্য জীবনে এসে উত্তম প্রতিবেশীদের কাছে, বিশ্বম্ভরের কাছে তার অতীত জীবন নিয়ে কিন্তু কোনো ধোঁয়াশা রাখেনি। শুধু টুকীর কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয়টুকু সযত্নে গোপন রাখতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। মোক্ষর মা টুকীকে জানিয়ে দিয়েছে 'উত্তম বেশ্যে' ছিল—যেকথা উত্তমকে সবচেয়ে বেশী দগ্ধ করেছে। আর যে নারী সত্তার কারণে উত্তম গৃহী নারী হয়ে উঠতে চেয়েছিল, তারও প্রকাশ রয়েছে তার দৃঢ়চেতা মনোভাবের মধ্যে। যে উত্তম হিরণের

মৃত্যু সংবাদে কেঁদেছিল অকৃত্রিমভাবে, সে বিশ্বম্ভরের দ্বারা বিড়াল-শকুনের তুলনা দ্বারা অপমানিতা হয়েও নীরব থেকেছে। কিন্তু বিশ্বম্ভরের ইয়ার-বন্ধুদের দ্বারা 'খাণ্ডারী' বলে অভিযুক্ত হলেও গৃহে টুকীর সামনে মদ্যপানের আসরের অনুমতি দেয়নি। বিশ্বম্ভরের কাছে প্রতিবাদ করে সে জানিয়েছে—''...স্ত্রীকে বেড়ালের মতো রাস্তায় পুরে বিদেয় করা কি দুধ মাছ দিয়ে তাকে পোষা তোমাদের ইচ্ছে; কিন্তু তাকে নিয়ে তোমাদের একি খেলা।''[২৬] শুধু এইভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে নয় বিশ্বম্ভরের হাত ধরে সংসারে এসে বিশ্বম্ভরের কাছে নানাভাবে অপমানিতা হয়েও আত্মবিশ্লেষণ করেছে এই বিশ্বম্ভর লোকটিকে কেন সে আশ্রয় করেছে, সেটা তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। বিষয়টিকে তার নিজের কাছেই জটিল সমস্যার মতো মনে হয়। তখন নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে উত্তম দেখতে পায় সেখানে বিশ্বম্ভরের জন্যে খুব একটা স্থান নেই। অথচ তার গৃহ বুভুক্ষা এই লোকটিকে ঘিরে বাস্তবরূপ পাবে বলে তার মনে হয়েছিল প্রথমাবধি। শত লাঞ্ছিতা হয়েও তার গৃহ বুভুক্ষা মরে নি। বরং তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল টুকীকে আশ্রয় করে। টুকীকে সে পড়াশুনা থেকে শুরু করে ঘর-গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ শিখিয়েছে। টুকীর দিকে তাকিয়ে তার মাতৃসত্তা স্পষ্টতই অনুভব করেছে—''এ মেয়েটি তার পেটের মেয়ে নয়—একেবারে পর—কিন্তু ইহার দিকে চাহিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তার দেহমন শীতল হইতে থাকে। চিরন্তনী কন্যা এ। বধূ, স্ত্রী, জননী। শরতের আকাশ যেমন অনাবিল, ইহার জীবনও আদি প্রান্ত হইতে কল্পনায় যতদূর দেখা যায় সেই শেষতম প্রান্ত পর্য্যন্ত তেমনি ছায়াহীন অনাবিল। পৃথিবীর কাহারো দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার সংকোচের হেতু নাই।''[২৭] এই টুকীর বিয়ের প্রসঙ্গ এলেই উত্তমকে আমরা আর ব্যক্তিত্বময়ী রূপে পাই না। মূলত তারই কারণে বারবার টুকীর বিয়ে ভেঙ্গে গেলে বিশ্বম্ভর উত্তমকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে তার স্থূল ভাবনার দ্বারা। উত্তমের মন ভেঙে গেছে। নিজেকেই তার অপরাধী মনে হয়েছে। টুকীর কাছে সে ক্ষমাও চেয়েছে। টুকীকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলেছে—''টুকী, আমায় তুই ক্ষমা কর—আমি তোকে সুখ দেব ব'লে আসি নাই, কিন্তু তোর সুখ ইচ্ছে করেছি ভগবান তা জানেন। কিন্তু অন্তরায় দাঁড়ালাম আমিই।''[২৮] এইভাবে এক সময়ের গণিকা উত্তমের অন্তর্গত যে আবেগ ও প্রকাশের আন্তরিকতা তা কোনভাবেই মিথ্যে নয়। ফলে গণিকার ভেতরে অনায়াসেই একজন স্ত্রী এবং জননীকে আমরা খুঁজে পাই। এখানেই লেখকের অনন্যতা।

উত্তমেরই ভিন্ন পীঠ টুকী। জন্ম মুহূর্তেই মাকে হারিয়ে প্রতিবেশীদের আদরে অবহেলায়,

পিতার উদাসীনতায় তার জীবন শুরু হয়েছিল। চরম বিপর্যয় কাটিয়ে তার জীবনে পরম আশ্রয় হয়ে ওঠে উত্তম। মাকে পেয়ে অসহায় মেয়েটির জীবনের গতি বদলে যায়। তার চেতনায় বাস্তবতা আর নৈতিকতার বোধ গড়ে উঠতে থাকে। উত্তমের শিক্ষা টুকীকে একটা পরিপূর্ণ নারী করে তুলেছে। যে উত্তমকে সম্মান যেমন করতে শিখেছে তেমনি বাবা বিশ্বম্ভরকে ক্ষমা করেছে। যাবতীয় পরিপূর্ণতা সত্ত্বেও শুধু উত্তমের কারণেই তার বিয়ে হয়ে যায় পঞ্চাশোর্ধ বিপত্নীক, রক্ষিতা পরিবৃত পরিতোষের সঙ্গে। এই বিয়েতে উত্তমের সায় ছিল না। কিন্তু টুকী মাকে নিরস্ত করে বলেছে—''মা, তুমি বাবাকে ক্ষমা করো; বাবা কিছু বোঝে না।''[২৯] বাস্তবতা আর ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে অনায়াসেই সমন্বয় করতে পেরেছিল টুকী। তাইতো তার অহং দ্বারা সে বাস্তবের কঠোর কঠিন জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল। প্রথমাবধি খটকা থাকলেও স্বামীর রক্ষিতা সুন্দরীকেও সে স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। বিয়ে হয়ে এসে নিরানন্দময় অন্ধকার পরিবেশে পৌঁছে টুকীর মানসিক অবস্থা ঝড়ে বিধ্বস্ত পাখির মতো হয়েছে। কিন্তু সে তবু ভেঙ্গে পড়েনি। সাধ্যমত সংগ্রাম ও সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে। পরিতোষের কাছে সুন্দরীর পরিচয় জানতে চেয়ে উত্তর পেয়েছে, 'তোমার মা, তোমার বাবার যা হয়'। খুব দ্রুত সে সুন্দরী-পরিতোষের দ্বারা সৃষ্ট পিঞ্জরে যে বন্দিনী সেটা বুঝতে পেরেছে। তবু মায়ের শিক্ষার কারণে সে স্বামীর প্রতি শেষ পর্যন্ত ভক্তি রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে ঘটাতে, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের বৃত্তে আবদ্ধ থেকে পরিতোষ ও সুন্দরীর দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হতে তার ভেতরের পর্যুদস্ত নারীসত্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে অচিন্ত্যর আগমনের পর। বিয়ের পর থেকে সে পরিতোষ আর সুন্দরীর যাবতীয় লোভাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। বাবার কাছে চিঠি লিখে টাকা আনিয়েছে। মা ও বাবার যাবতীয় অপমান সহ্য করেছে প্রায় নীরবে। তার ভেতরের শুভ ও সুন্দরবোধ সুন্দরীর কুশ্রিতাকে মৃদু আঘাতও হেনেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ভেতরের অহং বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাকে ভোগ করতে আসা অচিন্ত্যকে সে সরাসরি আহ্বান জানিয়ে বলেছে—''এ কাজ যদি করতে হয়, আমি আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?''[৩০] ভারতীয় সনাতন নারীর গণ্ডীটুকু মেনে নিয়েও সে যাবতীয় পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সুন্দরীর বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়ে বাইরে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তম থেকে টুকী একটা বৃত্তে নারীর মনোগহনের রক্তচ্ছবি চিহ্নিত

হয়ে গেছে সব রং নিভে যাওয়া অন্ধকার পাণ্ডুলিপিতে জোনাকীর আলোর অক্ষরমালায়।

'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর আপাদমস্তক অদস্ -এর সত্তাজাত সুখভোগের পঙ্কিলতায় আবদ্ধ ছিল। তার মধ্যে ছিল না কোন শুভবোধ ও নৈতিকতা। কেবল পরবর্তী সময়ে টুকীর বিয়ে এবং বিবাহ পরবর্তী অধ্যায়টুকুতে বিশ্বম্ভরের পিতৃসত্তা ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ভোগাকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত বিশ্বম্ভর ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতেই মদের আসর বসিয়েছিল এক শ্রাবণ সন্ধ্যায়। গর্ভবতী স্ত্রী হিরণ তার চাহিদামত চাটের উপকরণ সরবরাহ না করার ফলে তার দ্বারা প্রহৃত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে পিচ্ছিল উঠানে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এ নিয়ে খুনি বিশ্বম্ভরের মনে কোন তাপ-উত্তাপ ছিল না। ছিল না নবজাতিকা টুকী সম্পর্কেও কোন মানসিক উদ্বেগ। বরং সে টুকীকে ফেলেই বারবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। পরে উত্তমকে সংসারে এনেছে, সেটা টুকীর কথা ভেবে নয়। নিজেরই লাভালাভের হিসেব কষে। স্ত্রী উত্তমকেও সে সম্মান দেয়নি। বরং অসম্মান করেছে প্রতিপদক্ষেপে। উত্তমকে সে 'গৃহী নারী' হয়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যঙ্গ করেছে। এসবের মধ্যদিয়ে তার মনের কুৎসিত রূপটিও প্রকট হয়েছে। তবে উত্তমকে হারাবার ভয় তার মধ্যে ছিল। শেষপর্যন্ত পিতৃসত্তার জাগরণে বিশ্বম্ভরের মনের একটা শুভ দিক ফুটে উঠেছে ক্ষণপ্রভার মত। লালমোহনের আনীত পাত্রের সন্ধান ও পাত্রপক্ষ কন্যা দেখে যাবার পরেও বিয়ে ভেঙে যায় বেনামী চিঠিকে কেন্দ্র করে। এরজন্য উদ্বিগ্ন বিশ্বম্ভর উত্তমকেই দায়ী করেছে। অথচ অকৃতজ্ঞের মতো ভুলে গেছে যে উত্তমের অর্থেই তার অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। টুকীর বিয়ের পর পরিতোষের গৃহে গিয়ে বিশ্বম্ভরের পিতৃসত্তার অসহায়ত্বই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আপাদমস্তক স্বার্থান্ধ এই চরিত্রটির নির্মল পিতৃসত্তাটুকু তার মনোলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটুকু বাদ দিলে বাকী অংশে চরিত্রটির মনোলোক উদ্‌ঘাটিত করে লেখক উত্তমের ভাবনায় জানিয়েছেন—''বিশ্বম্ভরের মনের প্রবণতায় একটা হদিস্ পাওয়া গেল—মোহ তার জন্মে, কিন্তু অপছন্দ হইলে, গায়ে হাত তুলিতেও তার বাধে না—নৈতিক মর্য্যাদার বোধ নাই-সূক্ষ্ম সুখ-দুঃখের ধার সে ধারে না—গা ছাড়িয়া দিয়া ধরা দিলে সে ফেলিয়া দিতে চায়—বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ঘুরিয়া আসে—পনর' আনা মেরুদণ্ডহীন মানুষের এই চরিত্র—''[৩১]

সমাজ সংসারের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অদস্, অহং আর অধিশাস্তার কমবেশী ক্রিয়াশীলতা থাকে। অর্থাৎ সবচেয়ে ভালো মানুষটির মধ্যেও যেমন কিছু না কিছু খারাপ গুণ

থাকে আবার সবচেয়ে খারাপ মানুষের মধ্যেও কিছু না কিছু আলোর বিন্দুর বিচ্ছুরণ থাকে তা সে প্রচ্ছন্ন বা প্রকট যেভাবেই হোক না কেন। কিন্তু জগদীশবাবু বোধহয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেখক যিনি মানুষের মধ্যে এই দ্বৈতসত্তার কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁর সৃষ্ট এমন মানুষের মধ্যে অন্যতম হল পরিতোষ চরিত্রটি। আজীবন 'কোমর বাঁধা শয়তান' এই চরিত্রটি মানুষকে নানাভাবে ঠকিয়েছে। অল্প কয়েকদিনের জন্যে বিয়েও করেছিল। কিন্তু তার কোনো স্মৃতি এর নেই। সুন্দরীকে নিয়ে দীর্ঘ তিন দশক কদর্য জীবন কাটিয়ে শেষে কীর্তনের আসর খুলে বসেছে। বঙ্কুর মতো সরল শিষ্যের কাছে খোলের মাহাত্ম্য কথা শুনিয়েছে। আবার সংসারের অনটন মেটাতে নিছক অর্থের লোভে বঙ্কুর আনিত প্রস্তাবে টুকীকে বিয়েও করেছে। কিন্তু টুকীকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। টুকীর ভাবনায় এর স্বরূপ উন্মোচিত করেছেন লেখক—''এই ব্যক্তি তাহার পিতার দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহার মায়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। সঙ্গে সে আসিয়াছে আনুসঙ্গিকভাবে। সে পত্নী নয়, দায় মুক্তির দক্ষিণা।''[৩২] পরিতোষের যৌবন বয়সের ছবিতে মালা দিয়ে টুকী স্বামীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু পরিতোষের অন্তর্গত কুৎসিত মনটি সেই বেদীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে এবং সংসারের উদরপূর্তি ঘটাতে টুকীকে পাপের পথে ঠেলে দিয়েছে। চরিত্রটির মনোজগতের কুটিলতা খল চরিত্রের শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে। ড. সরকার আবদুল মান্নান প্রসঙ্গত লিখেছেন—''ভালো ও মন্দের, শুভ ও অশুভের এবং ন্যায় ও অন্যায়ের এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবর্তে মানুষ সর্বদাই ঘুরপাক খায়। কিন্তু পরিতোষ চরিত্র আমাদের এই সনাতন ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত করে। তার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে নিরন্তর অন্যায় ও অপরাধের মধ্যে নিমজ্জিত। শুভ, সুন্দর ও কল্যাণের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই।''[৩৩]

উত্তম থেকে টুকী—গণিকা জীবনের পরম্পরার যে ইতিহাস সুন্দরী হল তাদের মধ্যবর্তী একটি কদর্য সত্তা। অদস্ তার চেতনা জুড়ে। উত্তম সম্পর্কে মাত্র একবার মাথানত করা ছাড়া এই নারীর অন্তর্জগৎ জুড়েও পঙ্কিলতার ধারা বহমান। অর্থ লালসা আর লিবিডো চরিত্রটিকে তাড়িত করেছে। পরিতোষের রক্ষিতা হিসেবে তার যৌনজীবনের পরিচয় উপন্যাসে না থাকলেও টুকীর সঙ্গে তার যাবতীয় কথোপকথনের মধ্যদিয়ে তার মধ্যে একটা ভোগী নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়। আপাদমস্তক স্বার্থপর এই চরিত্রটি যখন চূড়ান্ত আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়েছে তখনই পরিতোষকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে—''...আমার ওজর নেই, করো তুমি বিয়ে।

আর পারিনে দিনরাত নেই নেই করতে—ইঁদুরে খুঁটে খাবে এমন দানাটিও নেই ঘরে। আমার মায়ের মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে—মা মরেছে পালঙ্কে শুয়ে; আমি ডোমপাড়ার ঘাটে মরব না—তুমি বিয়ে করো।"[৩৪] সমাজ সমর্থিত নীতিবোধ, মূল্যবোধ—এসবের কোনো বালাই তার মধ্যে নেই। সে যেন একটা বিগত যৌবনা 'হস্তিনী' নারী—যার সমগ্র সত্তা জুড়ে কামনার সরীসৃপ কিলকিল করে। এই কামনাময়তা থেকেই সে টুকীকে জানিয়েছে 'পাপপুণ্য' বলতে কিছু নেই, শরীরের সুখই সুখ, মনের সুখও শরীরের সুখ দিয়েই আসে। এই সুখের স্বর্গ সে রচনা করেছে টুকীর অভুক্ত যৌবনের দিকে তাকিয়ে থেকে—"... সুন্দরী মুগ্ধ হইয়া তাহার নিটোল যৌবনের দিকে চাহিয়া রহিল। কেমন একটা লালসা সুন্দরীর মনে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল, যেন ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সহস্র লম্পটের রিরংসাদাহ তৃপ্ত করিতে দু'হাতে বিলাইয়া দেয়। সুন্দরীর যৌবনোল্লাসের সুপ্ত প্রেতমূর্তি একবার দাঁড়াইয়া উঠিল—যেন অতৃপ্তির ঢেউ এখনো বহিতেছে—প্লাবনের আকাঙ্ক্ষা বুকে বহিতেছে।"[৩৫] এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্যই পরিতোষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে টুকীর ঘরে অচিন্ত্যকে পাঠিয়েছে। টুকীকে দেহ ব্যবসার কাজে লাগিয়ে সে তার ভোগ বাসনার পূর্ণ নিবৃত্তি করতে চেয়েছে। ইতিপূর্বে বিশ্বম্ভরের সামনে দাঁড়াতে সে মুহূর্তকালের জন্য সংকোচবোধ করেছিল, বিশ্বম্ভর যখন টুকীকে দেখতে এসেছিল। আর উত্তম সম্পর্কে তার শ্রদ্ধাও ঝ'রে পড়েছিল—"উত্তমকে সে দেখে নাই—টুকী এবং বঙ্কু কেবল দু'একবার তাহার নামোচ্চারণ করিয়াছে মাত্র—সুন্দরীর সম্মুখে সে ছায়া নিক্ষেপ করে নাই; কিন্তু এখন তার মনে হইয়াছে, উত্তম স্বাভাবিক নয়, অনুকূল নয়, অপরিচিত নয়, সুদূর নয়। সুন্দরী আরো অনুভব করিল, এই লোকটি (বিশ্বম্ভর) প্রণয়িণীয় মর্ম্মবাণী কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।"[৩৬] এই ক্ষণিকবোধের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে সুন্দরীর মনোলোক এবং তার কদর্য নারীসত্তা গণিকা জীবনের যেন চরম সার্থকতা লাভ ঘটে গেছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো ছাড়াও অপ্রধান চরিত্র বিশ্বম্ভরের ভগ্নিপতি লালমোহনের মধ্যে কমবেশী নৈতিকতা বোধের প্রকাশ আমরা দেখি। তবে বিশ্বম্ভরের বন্ধুরা যারা হিরণের মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষভাবে দায়ী, যারা বিশ্বম্ভরের গৃহে মদ্যপানের আসর বসানোর অনুমতি না পেয়ে উত্তমকে 'খাণ্ডারী' বলেছে তাদের ভেতরেও অদস্ সম্পূর্ণ মাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল। কিংবা স্বভাবতঃ ঈর্ষার কারণে মোক্ষর মা, মোহিনীর মতো চরিত্রেরা গরল ঢেলে দিয়ে উত্তমের জীবনকে দুর্বিষহ করে পরিতৃপ্তি খুঁজেছে। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়ে

সাম্প্রতিককালে যতই নতুন করে বির্তক হোক না কেন, সেসবের দিকে না গিয়েও আমাদের মনে হয় সমাজ মানুষের কুটিল বিসর্পিল মনোজগতের চিত্রাঙ্গণ করে জগদীশ গুপ্ত স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন।

লেখকের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের যথার্থ প্রয়োগ দেখি 'রোমন্থন' উপন্যাসেও। পল্লীজীবন সম্পর্কে দীর্ঘকালের গতানুগতিক ধারণার পাশে নতুনভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন লেখক আর সেটা করতে গিয়ে চরিত্রদের মনোলোকে স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়েছেন তিনি। তিন শহরবাসী মানুষ তাঁদের অগ্রজের আদেশক্রমে সাময়িকভাবে গ্রামের বাড়ীতে এসেছেন যেখানে তাদের পিতামহ ও তার পত্নী ভূমিষ্ঠ হলেও চিতায় উঠেছিলেন শহর কলকাতায়। আর গ্রামে বসবাসকারী অভয় ও কালোশশী নামক চরিত্রদ্বয়ের চোখ দিয়ে গ্রামদেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে শহরবাসী বাবুদের। শহরের বাবুরা গ্রাম সম্পর্কে একটা পূর্ব ধারণা নিয়ে গ্রামে এসেছিলেন সাময়িকভাবে, কিন্তু তারা গ্রামের মানুষদের চিনতেন না। এখানে এসেই গ্রামীণ মানুষের নীচতা-হীনতা ও দৈন্যতার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র—অভয়। সহায় সম্বলহীন অভয়কে ঠকায় কালোশশী। সে নিজেকে শহুরে বাবুদের স্তাবক করে তোলে। শহুরে বাবু-কালোশশী আর অভয়—এরা অদস্ তাড়িত তিনটি ধারার প্রতিনিধি চরিত্র। তাদের চোখে গ্রাম জীবনের তিনটি পৃথক চিত্র ধরা পড়েছে তাদের মানসিকতার কারণে।

গ্রাম সম্পর্কে শহুরে মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে তিন ভাইয়ের গ্রামে আসার পূর্বে বৈঠকখানার আড্ডায়। সেখানে সমবেত মনোজবাবু বলেছেন—''...'জমি' লোকের বিছানাতেই বজ্‌বজ্ করছে—বিছানা তো কাচে না, রোদে দেয় না কোন কালে! আত্মীয়তা করে' হঠাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠো না যেন।''[৩৭]

■ ''ক্ষিতিনাথ বলিলেন, শুনেছি পাড়াগাঁয়ে এমন ইঁদুর আছে যার ন্যাজের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিছুটির বিষ—ন্যাজটা যদি একটিবার মানুষের গায়ে ছোঁয়াতে পেরেছে তবে গা চুল্‌কেই মানুষ বেচারা মারা যাবে।''[৩৮]

■ ''ক্ষেত্র মোহন বলিলেন, জলের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে' গেল, পাড়াগাঁয়ে আর একটি উৎপাত আছে।... জলে নেম' না খবরদার! এক চাষী কোথায় যেন পাট ধুয়ে জল থেকে উঠে' দেখে একটা জোঁক তার নাইয়ে এক মুখ লাগিয়ে কোমর বেড়ে' ও মুখটা নাইয়ে লাগিয়েছে, আর এত রক্ত খেয়েছে যে, লোকটা অল্পক্ষণ পরেই অজ্ঞান হয়ে

গেল।"[৩৯]

শহুরে মানসিকতায় এইসব বর্ণনায় একটা কাল্পনিক গ্রাম আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে গ্রামীণ মানুষ নেই, নেই তাদের দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণার ভালোবাসার কোনো স্পর্শানুভব। অভয়ের মতো অভাবী মানুষ এইসব চোখের তারায় ধরা পড়ে নি। পশু যেমন বেঁচে থাকার জন্যে নিরন্তর ব্যস্ত, অভয়ও তেমনি সবকিছু হারিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টায় মুমূর্ষু। কালো শশীর মতো ঠকবাজ লোক তাকে পাটের দামে ঠকায়। এই কালো শশী আবার শহুরে বাবুদের জন্য উপযাচক হয়ে অভ্যর্থনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফলে অভয় আর কালো শশীর মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরী হয়ে গেছে। আবার অভয়ের পারিবারিক জটিলতা ব্যক্তিগত জীবনের সীমাহীন ক্ষোভ বাবুদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত অভয় সংসারে প্রবেশ কখনো করেনি, 'দ্বারের নিকট হইতেই বিতাড়িত হইয়াছে'। আসলে অভয়কে সংসার থেকে বিতাড়িত করেছে বাইরের কোন শক্তি নয় তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। দুর্বল অহং তাকে জীবনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। আর গ্রাম যেন অনেকটা শহরের উপনিবেশের মতো। ফলে ওদের স্তাবকতা করতে পারলেই কালোশশী নিজেকে ধন্য মনে করেছে। এইভাবে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র বর্ণনা নয়, লেখক মানুষগুলোর অন্তরের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে তুলে এনেছেন একের পর এক অবাক করা চিত্র। বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে কেবল অর্থনৈতিক সংকট বাড়ে নি, সেইসঙ্গে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কালবেলায় দাঁড়িয়ে শহুরে বাবুরা কেবল গ্রামীণ মানুষকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেছে স্তাবক কালোশশীকে—"... কিন্তু মুস্কিল কি জান! সব পল্লীরই এক সমস্যা নয়, কারো জলাভাব, কারো রোগ, কারো দারিদ্র্য, কারো আবার গো-সঙ্কট; ... কারও আবার তিন মাইল লম্বা এক খাল কেটে দিতে পারলে সুবিধা হয় বর্ষার জল বেরিয়ে গিয়ে আবাদ্ চলতে পারে। দেখ' কি দুরূহ ব্যাপার। তবে আমরা সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগ করে নিয়েছি, ম্যালেরিয়া আর গোচারণ ভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটিকে তাড়াব, আর একটাকে তৈরী করব।"[৪০]

'রোমন্থনে'র মতো 'দুলালের দোলা' উপন্যাসেও শহরবাসী নীরদবরণের চোখে গ্রামজীবন আর গ্রামীণ বৃদ্ধ পিরুর মুখ দিয়ে গ্রামীণ মানুষের কদর্য জীবনের ছবি বর্ণিত হয়েছে। গ্রামীণ মানুষ জাত-পাত ধর্ম-বর্ণের নিরীখে নানাস্তরে বিন্যস্ত এবং এ নিয়ে তাদের মনে কোনো ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে নিজের পাত নিজেদেরই ফেলতে

এবং ধুতে হয় দেখে নীরদবরণ গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারিক ঠাকুরের প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তার সংস্কারমুক্ত মনের যুক্তি ছিল—''...আগে মানুষ, তারপরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে, আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছে। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কিনা জানি নে, আপনি তা' করাবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ বাড়ী খেতে যাব না।"[৪১] দুশো সিঁদেল চোরের সর্দার দ্বারিক ঠাকুর এতে নীরদবরণের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়েছেন, সে ব্রাহ্মণকে চেনে না; অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের পাল্লায় সে পড়েনি। সত্যি নীরদবরণ এইসব মানুষের ভেতরটা দেখতে পায়নি। পরদিন পরিধেয় বস্ত্রাদি ছাড়া নীরদের সমস্ত কিছু চুরি হয়ে যায়। তবে উপন্যাসের প্রধান অংশ পিরুর বর্ণিত ঘটনার কোলাজ। পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থাদিতে যেসব যৌনতার গল্প আছে, এই অংশে পিরু সেই যৌন-জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী বর্ণনা করেছে। গ্রামের 'লক্ষ্মীদিয়া' থেকে 'পোড়া বৌ' নামকরণের ইতিহাসের মধ্যদিয়ে। সেই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে পিরু নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তিটি তার মতো করে নীরদবরণের কাছে তুলে ধরেছে যাতে শুধু পিরু না, গোটা গ্রামীণ মানুষের অন্তরের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে—

- ''... এই যে বাছুরটা চর্‌ছে দেখ্‌ছেন, পেট ভরানো ছাড়া এর আর কোনো কাজ কি আছে? নাই; পেট ভরলেই এ নিশ্চিন্দি। কিন্তু, বাবু, মানুষের খাই খাই আর মেটে না; ভরা পেটেও যেমন তার খাই খাই, খালি পেটেও তেম্‌নি; একদণ্ড সে নিশ্চিন্দি না; কত যে খাবে, তার কত যে ক্ষিদে তা' সে নিজেই জানে না; সে জ্ঞাতির সর্ব্বস্ব খায়, নিজের মাথা খায়, পরের পরকাল খায়, তবু তার খাওয়ার আশ্‌ মেটে না।"[৪২]

- ''আমি ভেবে দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, স'ধর্ম্মিণী, আরো অনেক কথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।"[৪৩]

এমনই এক দেহ-সর্বস্বতার ফসল সতীশ চরিত্রটি। তার পিতামহ ভারতের অবৈধ নারী আসক্তির কারণে অন্য নারীর গর্ভজাত সন্তান সে। এই পাপকর্ম দেখেও ভারতের স্ত্রী বাইরে কোনো প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু একদিন গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই থেকেই গ্রামের নাম 'পোড়া বৌ' হয়েছে। জন্মের এই কালো ইতিহাস সতীশের মনে একটি সহজাত অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছিল। ফলে সে সর্বদা একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগত। তার

এই মানসিক যন্ত্রণার কারণ বর্ণনা করে সমালোচক ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—''বিবাহের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছাড়াও নরনারীর ভালোবাসার সম্পর্ককে সমাজ ও সংস্কৃতি উচ্চমূল্য দিয়ে এসেছে। ভালোবাসার সম্পর্ক অনুসরণ করে যদি এ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত তবে সতীশ দাস সান্ত্বনা পেত। পিতা এবং নিজের জন্মের সার্থকতা খুঁজে পেত। ভালবাসাহীন যৌন সম্পর্কের ফলে পিতার জন্ম হওয়ায় এবং সে পিতার সন্তান বলে নিজেকে চূড়ান্ত অপরাধী মনে করে।''[৪৪] মানসিক বিকারগ্রস্ততার কারণেই তার বিচারবোধ লোপ পেয়েছে। সে পিতামহীর সঙ্গে নিজের স্ত্রীর এবং স্ত্রীর অবর্তমানে কন্যাকে দেখে অভিন্ন ক'রে, সন্দেহ করে। স্ত্রী ও কন্যাকে আক্রমণ করে সে আকাঙ্ক্ষিত শাস্তির প্রয়োজনকে তৃপ্ত করে। নীরদবরণ সেই মানুষটির মনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে—

- ''...আপন কন্যার প্রতি এ ব্যক্তি যে মিথ্যা এবং কুৎসিত কটূক্তি করে তাহাতে তাহার দ্বিধা নাই; যাহার অধিক কলঙ্ক স্ত্রী লোকের হইতে পারে না, সেই কলঙ্ক আপন স্ত্রীর চরিত্রে কেবল আরোপ নয়, সর্ব্বত্র প্রচার করিতে ইহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ নাই।''[৪৫]

- ''পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপের অনুশোচনায় নহে, একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই—তার ছট্‌ফটানির অন্ত নাই।''[৪৬]

এইভাবে নীরদের কথনের মধ্যদিয়ে লেখক মানুষের মনের কুটিল বিসর্পিল গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। এইসব মানুষগুলোর অন্তরে অদস্ যত প্রকট অহং কিংবা অধিশাস্তার প্রকাশ নেই বললেই চলে। পিরুকে কেবল পল্লীজীবনের 'বিবেক' বলা যায়।

জগদীশগুপ্তের গ্রামকেন্দ্রিক 'ত্রয়ী' উপন্যাসের তৃতীয় উপন্যাস 'যথাক্রমে'। ছোট্ট নদী চন্ননার তীরে অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম বেতডাঙ্গার মানুষগুলির অন্তরমহলে লেখক অনায়াসেই পৌঁছে তুলে এনেছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাঠ। উপন্যাসের কাহিনীর দুটি অংশ—একটি রামপ্রসাদ ও তার ছেলেমেয়ের দুঃখ-কন্টকিত জীবন আর দ্বিতীয়টি নিত্যপদ নামক ডাক্তারের স্বপ্নভঙ্গ। গ্রামস্থ মানুষগুলির লোভ-লালসা-পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ-জাতপাত ইত্যাদি ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে বর্ণনা করে লেখক তাদের 'আঁতের কথা' তুলে এনেছেন। স্ত্রীর মৃত্যু রামপ্রসাদের অন্তরকে যতটা আঘাত করেছিল, মাকে হারিয়ে দীনবন্ধু ও সাবিত্রীর জীবন

ততোধিক সংকটে পড়েছিল। এই মানসিক সংকট আরও ভয়াবহ হয়েছে পিতা রামপ্রসাদও চলে গেলে। পিতার মৃত্যুর পর অসহায় নাবালক দুটিকে গ্রামের মানুষ যা দিয়েছিল তার নিখুঁত বর্ণনা করেছেন লেখক—"...দীনুদের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সবাই সৎ পরামর্শ দিল যত, তাহাদের আগ্‌লাইবার কেহ নাই দেখিয়া ফাঁকি দিল তার ঢের বেশী। তাহাদের প্রাপ্য পয়সা আগ বাড়াইয়া কেহ দিতে আসিল না। খাতায় হিসাব উঠিত না; অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সজ্ঞান অপরাধের সাজা কঠিনতর জানিয়াও রামপ্রসাদের এই কাঁচা কাজের সুযোগ ত্যাগ করিলেন না।"[৪৭]

ছদ্মবেশী এইসব ঠক প্রতারক ছাড়াও দীনবন্ধু-সাবিত্রীর সমস্যা কন্টকিত জীবনে ক্ষণপ্রভার মত এসেছিল গোবিন্দ ঠাকুর—যার কারণেই এরা সংসার সমুদ্রে শেষপর্যন্ত ভেসে যায়নি। দীনবন্ধু ব্যবসা সামলে বোনের বিয়ে দিয়েছে ভিন্ গাঁয়ে। কিন্তু সেখানে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর মত দাঁত-নখ বের করে বোনকে প্রতিনিয়ত শাস্তি দিলে দীনবন্ধু সেই সংবাদে ভেঙ্গে পড়েছে। আসলে তার অন্তরে গোবিন্দ ঠাকুর বাস্তব জগত সম্পর্কে ধারণা ঢুকিয়ে দিলেও তাব ব্যক্তিক অহং-এর দুর্বলতা হেতু সে বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে পারেনি। কিন্তু গোবিন্দ ঠাকুরের অহং অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তার সংস্পর্শে দীনবন্ধু ধীরে ধীরে মাথা তুলতে পেরেছে। আর সাবিত্রীও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে শেষে প্রত্যাঘাতের জন্য মরীয়া হয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি বশে—

"... এখন শাশুড়ী যদি বলে এক কথা সাবিত্রী শোনায় তাকে দশ কথা, শাশুড়ী যদি তোলে কঞ্চি, সাবিত্রী তোলে বাঁশ, পারুল ডাঙায় সবাই বল্‌ছে, বেটি জব্দ।

— শিবু?

— সে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে। আমার মাসী বলে, 'কালী-মা এবার রণে চেপেছেন।"[৪৮]

উপন্যাসের কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে অন্তরস্থ নৈতিকবোধ আর মূল্যবোধের তাগিদ থেকে দাদার মৃত্যুর পর ডাক্তার নিত্যপদ গ্রাম সমাজকে সুস্থ-সুন্দর করে তোলবার স্বপ্ন নিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রামেই চলে আসে। কিন্তু গ্রামীণ মানুষের অন্তরস্থ কদর্যরূপ আর ষড়যন্ত্রের কারণে তার মোহভঙ্গ হতে দেরী হয়নি। গ্রাম সম্পর্কে তার যে গর্ব ও উচ্ছ্বাস ছিল তা গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ফণী, প্রধান মতিলালদের ষড়যন্ত্রে ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়েছে। এ যেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক শশীভূষণের স্বপ্নভঙ্গ। আসলে যাবতীয় সদ্‌গুণ থাকলেও

নিত্যপদ'র ভেতরে অহং সবল ছিল না। ফলে সে বাস্তবতার সঙ্গে তার আদর্শের সমন্বয় ঘটাতে পারেনি। যদিও ক্ষণপ্রভার মতো তাঁর অন্তরে দু'একবার মহৎ ভাবনা জেগেছিল। একসময় সে ভেবেছে—"...ইহাদের বুদ্ধিই অল্প; তাহার প্রতি বিদ্বেষ ইহাদের কাহারো নাই, বিষ প্রয়োগের গুজবটা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হইতে পারে কি না সেইটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার উৎসাহটা বাদে ইহাদের অপর সকল দিকেই প্রেরণা আছে; ইহাদের কথায় রাগ করিলে নিজেকে ছাঁটিয়া ইহাদেরই সমান করিয়া খাট করা হয়।"[৪৯]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিত্যপদ আপন সংকল্পে অটল থাকতে পারেনি। সেও যেন 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়ে গেছে। সমস্তরকম সেবার মানসিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তার সহকারীকে জানিয়েছে, হাতুড়ে ডাক্তার ফণীর রাস্তাই সঠিক। গ্রামীর মানুষগুলিকে সেবা করা মূর্খামি। তাই সে কান্তিভূষণকে অনায়াসেই আদেশ দিয়েছে—"... আর ওষুধ বিতরণ করে' কাজ নাই। জল দিতে থাকো। ফণীবাবু দেশের লোকের নাড়ী ধরে আছেন—তার ব্যবহারই ঠিক। আমরা ভুল পথে চলেছিলাম, ভাই।"[৫০]

'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে লেখক শরৎ নাম্নী নারীর জীবনের অন্তর্দাহ ও করুণ পরিণতিকে ভাষারূপ দিয়েছেন। মোহিতের পুত্রবধূ শরৎ কঠিন দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে সামাজিক অপবাদ মাথায় নিয়ে; পুত্রের কাছে নিজের সম্ভ্রম রক্ষায় শেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। শরতের স্বামী বিদুরের ভাবনায় লেখক জীবন সংগ্রামে পরাস্ত একজন মানুষের মানসিক যন্ত্রণার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন—"... মিথ্যে নয়; মনটাকে ক্ষয় ক'রে এনেছি... যে ইচ্ছার জোরে মানুষ বেঁচে থাকে সে জোর আমার নেই, আমি তা বোধ করছি। এখন খুবই ইচ্ছে হচ্ছে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকি... কিন্তু সে ইচ্ছাটা আমি এতদিন নিজের অজ্ঞাতেই প্রতিমুহূর্তে লঙ্ঘন ক'রে গেছি।... এখন দেরী হ'য়ে গেছে।"[৫১] এরপর চরম দারিদ্র্যকে সম্বল করে শরৎ পুত্রকে নিয়ে নিজের দুটি ঘরের একটিতে ভাড়াটে বসিয়ে বাঁচার পথ খুঁজেছে। একদিন ছেলের জন্যে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে গিয়ে কামুক মনোহর দত্তের দ্বারা আহূত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর শরৎ হয়ে উঠেছিল সন্তানের অভিভাবিকা, শুধু মা নয়। কারণ মৃত্যু-শয্যায় স্বামী তাকে ছেলের ভার দিয়ে গেছে—অথচ মনোহর প্রদত্ত অপবাদ তার জীবনে চরম সংকট ঘনিয়ে তোলে। মনোহরের রক্ষিতা সুখী শরতের কাছে এসেছে নিজের গচ্ছিত ধন মনোহর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে। এই সুখী 'লঘুগুরু'র সুন্দরীর মতোই। তার কোনো মানসিক

উত্তরণ নেই। কোনো শুভবোধ নৈতিকতা তার নেই। একেবারেই অদস্-এর বশীভূত সুখী অনায়াসেই শরৎকে কুৎসিত আহ্বান জানিয়ে বলেছে—''... আয়, আমার সঙ্গে আয়; আমার ঘরে থাকবি। নিত্যি নতুন নাগর এনে দেবো, কাব্‌লি, মেড়ো, খোট্টা।... ভিজে বেড়ালটি আমার, নেকী, মুখে রা শব্দটি নেই।... ঘরে থেকে ডুবে ডুবে পরের জলে নোলা ভেজাবি-কতদিন? ... আয় বেরিয়ে।''[৫২] অন্তরস্থ অহং-এর দুর্বলতার কারণে শরৎ এরপর আর নিজেকে কঠিন বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করাতে পারেনি। ভুলে গেছে মৃত্যু শয্যায় স্বামীর বলে যাওয়া ছেলেকে মানুষ করার কথা। নিজের কাছে পরাজিত শরৎ শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

মনস্তত্ত্বের নিরীখে দেখলে দেখা যায় জগদীশবাবুর সৃষ্ট পুরুষেরাই মেয়েদের চেয়ে দুর্বল চিত্তের। এরকমই এক দুর্বল মানসিকতার মানুষ 'সুতিনী' উপন্যাসের দুর্গাপদ। উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন—''...বাঙালির সংসার-সমাজে নারীর (এবং পুরুষেরও) যৌনতা ভিত্তিক মনোকুটের অর্থাৎ সেক্স-অবসেশনের এই উৎসটি সুপরিচিত। জগদীশবাবুর উপন্যাসে মনোবিকারের যে বিচিত্র চরিত্র-মূর্তি অংকনের চেষ্টা তার মধ্যে সুতিনীর সমস্যাটি বিশেষভাবে বাঙালি জীবনের অঙ্গ।''[৫৩] উপন্যাসের নায়িকা রাজবালা পরপর চারটি মৃত পুত্র প্রসব করায় তাদের শান্তিপূর্ণ সংসারে সমস্যার করাল ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। মৃত সন্তান প্রসব করার দায় রাজবালা চাপিয়েছে স্বামীর ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর। এক্ষেত্রে তার শৈশব থেকে জাত সহজাত আক্রমনাত্মক প্রকৃতি কাজ করেছে। নিজেকে এবং নিজের জরায়ুকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে স্বামীর সঙ্গে জোরপূর্বক নিজের বোন মধুবালার বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপরই তার আক্রমনাত্মক প্রবৃত্তি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। বিয়ের অল্পকালের মধ্যে মধুবালা পুত্রবতী হওয়ায় রাজবালার অন্তরের সুপ্ত ঈর্ষা এখন আগ্নেয়গিরির মতো প্রবল অগ্ন্যুৎপাত শুরু করে। কেবল ঈর্ষা নয়, নিজের পরাজয়ের গ্লানি ও আত্মধিক্কার তাকে জর্জরিত করে তোলে। এরপর সে পঞ্চমবার সন্তান ধারণ করে নিজের জরায়ুর অপবাদ ঘুচিয়েছে। রাজবালার মধ্যে অহং-এর নেতিবাচক দিকগুলি যত প্রকট সেই তুলনায় দুর্গাপদ অনেক বেশী ইতিবাচক। শেষপর্যন্ত পুত্রের জন্ম দিয়ে রাজবালা চিরশয্যায় শায়িত হয়েছে—

''কালীতারা ছট্‌ফট্ করিতেছেন—ছেলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু ফুল পড়ে নাই।

—'দাই, পেটে চাপ দে, পোয়াতির মুখে চুল দে'—

দিতে দিতেই রাজবালার চোখ উল্টাইয়া গেল—গলায় উদ্‌গারের মতো একটা শব্দ হইল—রক্তহীন দেহ কাঁপিতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নয়, নিঃশ্বাস সহজভাবে চলিতে চলিতেই এক নিমেষে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।"[৫৪] রাজবালার মনের অচেতন অংশে যে অপরাধবোধ দৃঢ়তর হয়েছিল—তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে তার মৃত্যু—যা ছিল তার কাছে অবধারিত শাস্তির মতো।

'সুতিনী' উপন্যাসে রাজবালার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বই 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসে রাম চরিত্রটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র তিনটি—রাম, তার স্ত্রী গয়ামণি এবং পুত্র লব। সর্প দংশনে পুত্র লবের মৃত্যু হলে স্বামী-স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরস্থ অহং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থেকে পুত্রহারা গয়ামণির মনে হয়েছে লখীন্দরের মত তার ছেলের মৃতদেহ ভাসিয়ে দিলে কোনো মহৎ গুণীনের হাতে পড়ে পুনর্জীবন লাভ করবে। গয়ামণির এই বিশ্বাসের মধ্যে সংস্কারের পনের আনা মানুষের মনের অন্ধ বিশ্বাস আর মায়ের পুত্র বাৎসল্য ধরা পড়েছে। পুত্রহারা অপ্রকৃতিস্থ গয়ামণি নদীর ধারে গিয়ে একদৃষ্টে দূরের দিকে চেয়ে থাকে। কল্পনা করে ছেলের সর্পদংশনাহত দেহটি সকলের সেরা গুণীর কাছে পৌঁছে গেছে এবং গুণী তার প্রাণ বাঁচিয়ে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। স্বপ্নভঙ্গ হয়। পুত্র শোকাতুরা গয়ামণির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে রাম গৃহের মেঝেতে গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সাপটিকে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে শেষ পর্যন্ত। এই মৃত্যুর মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা করে ড. প্রবীর কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—''সর্পের দংশনকে স্বেচ্ছায় বরণ করায় রামের বিশেষ একটি মানসিকতা ধরা পড়েছে। প্রতিশোধ গ্রহণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত ছিল সর্পকে হত্যা করা তা না হয়ে সে নিজেই সর্প দংশনে নিহত হল। সর্পকে দেখে তার উল্লাস, আকাঙ্ক্ষা পূরণের আগ্রহ অবিকৃতরূপে সর্প দংশনের যন্ত্রণা বরণ করা, এর মধ্যদিয়ে আকাঙ্ক্ষিত শাস্তি লাভ করার তৃপ্তি প্রকাশ পেয়েছে।"[৫৫]

আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্কে কেবল দেহ সর্বস্বতা নয়, থাকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সেই যৌথ সত্তার সহাবস্থান না হলে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কদর্যতা ঠেলে এক ট্রাজিক পরিণতি পায়। 'গতিহারা জাহ্নবী'তে অকিঞ্চন ও কিশোরীর দাম্পত্য জীবন শেষপর্যন্ত তেমনি এক পরিণতি লাভ করেছে। অবশ্য সম্পর্ক যখন চূড়ান্ত ভাবে ভাঙনের মুখে তখন কিশোরীর

সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ একটা সেতু হয়ে উঠেছে। প্রবৃত্তি তাড়িত অকিঞ্চন এতটাই অদস্-এর বশীভূত যে তার ভেতরের অহং আর অধিশাস্তা প্রচ্ছন্নই থেকে গেছে। একান্তভাবেই দেহসর্বস্ব অকিঞ্চন নিজের স্ত্রীকে কোনো সম্মানতো দেয়ই নি উপরন্তু স্ত্রীর সখিকে লাভ করার কদর্য বাসনা প্রকাশ করতে একটুও লজ্জিত হয়নি। লেখক জানিয়েছেন—''অকিঞ্চন তখন সেই মেয়েটির কথা বলে—যে তার স্ত্রীর সই আর যার চোখের কথা ভোলা যাইতেছে না—অকিঞ্চন তার মনের কথা এমন করিয়া লালসা দিয়া ফলাইয়া গাল ভরিয়া বলে যেন কিশোরীর সঙ্গে বিবাহ না হইয়া সেই মেয়েটির সঙ্গে বিবাহ হইলেই আক্ষেপের কিছু থাকিত না।...''[৫৬]

অদস্-এর বশীভূত অকিঞ্চনের মধ্যে নীতিবোধের ছিঁটেফোঁটা না থাকায় সে স্ত্রীকে শুধু অপমানই করেনি, বাগ্‌দী পাড়ায় 'খারাপ' মেয়েদের সঙ্গে তার যৌন-সম্পর্কের বিষয়েও সবাই জেনে কী ভাবল সেটা নিয়েও কোন হেলদোল ছিল না। এক অসম মানসিকতার দাম্পত্য জীবনে কিশোরীর অহং দুর্বল হওয়ায় সে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেনি। সমস্ত মানসিক যন্ত্রণা নীরবেই সহ্য করেছে। স্বামীর জৈব বীজের ফসল দেহে ধারণ করে তার জীবনের মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীর মতোই। সন্তানের মা হতে পারার যে ঈশ্বরিক আনন্দ নারী মাত্রেই লাভ করে সেই আনন্দধাম থেকে নির্বাসিত কিশোরীর মনে হয়েছে এই মাতৃত্ব নিরর্থক অযাচিত ব্যাপার, হাস্যকর এবং হৃদয় বিদারক। প্রসঙ্গতঃ তার মনের অবস্থা বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন—''... এই সন্তান কি স্বামীর আত্মজ? স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্ম্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত, ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।''[৫৭]

এই মাতৃত্ব লাভ না করার এক ভিন্নধর্মী মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসে মল্লিকার ভাবনার মধ্যদিয়ে। তার শাশুড়ি কামিনী বংশ রক্ষার জন্য নাতি চেয়েছে, বৌকে চায়নি। আর মল্লিকা অসুস্থ শরীরে গর্ভধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করেছে। এবং নিজের জীবনের কথা ভেবে পুনরায় আর সন্তান ধারণ করতে চায়নি। এটা নিয়ে সে আদালত পর্যন্ত যেতে পিছুপা হয়নি। নারীর জীবনে মাতৃত্বই একমাত্র লক্ষ্য—এই শাশ্বত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে মল্লিকা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে। হাকিমের আদেশে শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবার কথা নাকচ করে দিয়ে মল্লিকা বলেছে—''না, হাকিম; আমি সেখানে এখন যাব না। ... অসুখের সময়

ছেলে পেটে এসেছিল; মরতে বসেছিলাম। এ শরীরে আমি আর ছেলে চাইনে—ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না। রক্ষে করো আমাকে তোমরা।"[৫৮]

পুরুষের রূপজ মোহ ও তার সমস্যা নিয়ে 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের নায়ক নন্দ শহরে গৃহশিক্ষকতা করতে এসে মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী বলে জানত যে কৃষ্ণাকে তার অর্ধনগ্ন দেহ দেখে ফেলে তীব্র অপরাধবোধ পোষণ করেছে এবং শাস্তির ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভোগ সর্বস্ব অহং শূন্য নারী কৃষ্ণার কামজ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি নন্দ। পরবর্তী সময়ে অবশ্য স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ ভালোবাসার বৃত্তে সে ফিরে গেছে। নন্দর অন্তর্গত সুপ্ত অদস্ তাকে কৃষ্ণার প্রতি প্রলুব্ধ করেছিল। কৃষ্ণাও আহ্বান জানিয়ে তাকে বলেছিল—"পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে, আপনাকে আরো—আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান্।"[৫৯]

কৃষ্ণার আহ্বান প্রথমাবধি উপেক্ষা করেই নন্দ পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু তার অন্তরের কামনা বাসনাকাঙ্ক্ষী পুরুষ সত্তাটি নারীর রূপ পিপাসা পূরণ করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এই অন্তর্গত পুরুষসত্তাটি কৃষ্ণাকে ঘিরে স্বপ্নও দেখে। অর্থাৎ সচেতন সত্তায় যেটা পূরণ হয়নি, অবচেতন মন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তা পূরণ করতে চেয়েছে। লেখক সেই অবচেতনের স্বরূপ বর্ণনা করে লিখেছেন—

"... যা মানুষকে উদাস আর আন্‌মনা করে, নন্দ কিশোরের বেলায় আজ তা-ই ঘটিল রাত্রে, নন্দর নিদ্রিতাবস্থায়।

নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হালকা, কাব্য ক্ষুন্ন, এমন কি মরণশীল, পুরাণ অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। তা যা'তে না হয় সেই জন্যই বোধ হয় নন্দ কিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।"[৬০]

মণীন্দ্রবাবু নন্দর এই অন্তর্গত কামনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন তার কামুক সত্তার প্রকাশের মধ্যদিয়ে। সেই সঙ্গে তিনি অকপটে জানাতে ভোলেন নি, কৃষ্ণা তার স্ত্রী নয়; বলতে গেলে রক্ষিতা। তার খুড়তুতো বোন। স্ত্রী বিয়োগের পর সেই বোনের রূপে মুগ্ধ মণীন্দ্র কৃষ্ণাকে ঘরে তুলেছিলেন। প্রৌঢ় মণীন্দ্রের অন্তর্গত কদর্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে নন্দকে বাড়ীতে যাবার অনুমতি দিয়ে এবং তার সাময়িক গৃহে অবস্থান কালে স্ত্রী মমতাকে কতবার শারীরিকভাবে

লাভ করার সুযোগ পাবে সেটাও অঙ্ক করে বলে দিয়েছেন। তার মনের অন্তরালে অতৃপ্ত কামনা ছাড়া কোনো মূল্যবোধ-নৈতিকতাবোধ নেই। তার অবর্তমানে নন্দ বাড়ী থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণার রূপবহ্নিতে পতঙ্গ রূপে দরা দিয়ে দগ্ধ হবার প্রাক্-মুহূর্তে কৃষ্ণার মা নন্দকে সেই দগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেয়। তিনি নন্দকে সতর্ক করে দিয়ে জানান—''তোমাকে বলব কি বাবা মেয়েটা চিরকাল শয়তান।... রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছি-মিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নাই। মনে হয়—কাউকে ভালোবাসে না, বাস্‌তে পারেই না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই।''[৬১]

'লঘুগুরু' উপন্যাসের উত্তমের সঙ্গে এখানেই কৃষ্ণার চরিত্রের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। বহু পুরুষচারিণী উত্তমের ভেতরে সুস্থ-সুন্দর গৃহী নারী বাস করত। কিন্তু অদস্ তাড়িত কৃষ্ণা কেবল কামনার আগুনে একের পর এক পুরুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। তার হৃদয়ের কোন কোষেই 'ভালোবাসা' নামক কোনো বস্তু ছিল না। কৃষ্ণার দেহজ চক্রব্যূহ থেকে মুক্ত হয়ে নন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এবং অহং-এর পুনর্জাগরণের ফলে তার চোখের সামনে স্ত্রী মমতার স্নিগ্ধ মুখটা ভেসে উঠেছে।

দাম্পত্য প্রেমের যে স্নিগ্ধতা 'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' উপন্যাসে শশধরের স্ত্রীর মধ্যে ছিল, যার জন্যে সে স্বামীর প্রথমদিকের বীরত্ব আর পরোপকারের কারণে নিজেকে সে 'ভীমের স্ত্রী' বলে গর্ব অনুভব করেছিল এবং শেষে প্রতিবেশীর গৃহে ডাকাতির ঘটনায় শশধর কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমের 'ভান' করে পড়ে থাকলে তার স্ত্রীর কাছে সে কাপুরুষ প্রতিপন্ন হয়েছে—এমন রূপ 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের অভয়ার মধ্যে ছিল না। নিছকই জৈবিক তাড়নায় একদিন সে কন্যা শান্তিকে নিয়ে অতুলের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। পরে মেয়ে যতই বড় হয়েছে অতুলের প্রতি অবিশ্বাস তার বেড়েছে এবং শঙ্কিতা। মাতৃসত্তা আতঙ্কিত হয়েছে। বিশেষ করে অতুলের সঙ্গে শান্তির সমস্ত বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা এমন কী নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়েও মুক্ত আলোচনাকে শঙ্কিতা অভয়া ভালোভাবে নিতে পারে নি। ফলে একদিন রাত্রে সিনেমা দেখে ফেরার পর অভয়ার আকুল প্রশ্নে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে তার পূর্ব পরিচয়। শান্তির উদ্দেশ্যে ব্যাকুল অভয়া জানিয়েছে—''আমি পাগল হ'য়ে গেছি; আমার বুক পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। বল্ সত্যি করে', শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি ত'? ... ও তোর বাবা নয়, কেউ না; তোকে তিন মাসের কোলে নিয়ে ও'র সঙ্গে আমি কুলত্যাগ করেছিলাম।''[৬৩] শান্তির

অন্তর্গত অহং তাকে ছিটকে দিয়েছে এতোকালের পিতৃ মাতৃ আশ্রয় থেকে। মাকে অভিভুক্ত করে সে তার জন্মদাতার কাছে গেছে। কিন্তু মেরুদণ্ডীহীন জন্মদাতা তাকে আশ্রয় দেয়নি, দিতে সাহস পায়নি। ফিরে এলে অতুলের ভেতরেও কোনও পিতৃসত্তার জাগরণ দেখি না। শেষ পর্যন্ত শান্তির আশ্রয় হয়েছে নিস্তারণ মজুমদারের কাছে। অভয়া-অতুল কিংবা শান্তির পিতা বসন্ত—একই সরলরেখায় অঙ্কিত নষ্ট চরিত্র। কেবল অভয়ার মাতৃসত্তাটি অকৃত্রিম। যদিও লেখক শেষে শান্তির অহং-এর উত্তরণ দেখিয়েছেন—অবশ্য সেটা পুরোপুরি মনস্তত্ত্বের শর্ত পূরণ করেনি বলেই আমাদের মনে হয়।

নারীত্বের যে অভিমান 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরীকে অপদার্থ অকিঞ্চনের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, ঠিক একই কারণে শরীর সর্বস্ব সাতকড়ির কবল থেকে চিরমুক্তি চেয়েছিল অহং-এর অধিকারী স্ত্রী মাখন। সাতকড়ি যেন অকিঞ্চন নামক মুদ্রার ভিন্ন পিঠ। গৃহে মাখনের মতো স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে মধুডাঙ্গার মেলায় একাকিনী বিধবা যুবতীকে নিয়ে পৈশাচিক কৃতকর্মের অপরাধে দেড় বছরের জন্য জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে ফিরে এলে বাড়ীর সকলেই তাকে সসম্মানে গ্রহণ করে। কিন্তু স্ত্রী মাখন নোংরা আবর্জনার পঙ্কে নিমজ্জিত স্বামীর কাছে যেতে পারেনি। প্রবল ঘৃণা তাকে দূরে সরিয়ে এনেছে। এর জন্য শাশুড়ি তাকে বাড়ী থেকে চিরতরে বের করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কলঙ্কিত তীর্থ মুক্ত হয়ে ত্রিলোকপতির সাথে মাখন এক শান্তির স্বর্গ রচনা করে পুনর্জীবনে ফিরে গেছে। সেই মিলন মুহূর্তটি রচনা করেছেন লেখক মন্দিরে দু'জনের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে—

''ত্রিলোক বলিল,—বলো, দেবতা সত্য।

মাখন বলিল,—দেবতা সত্য।

— ধর্মের বিগ্রহ ইনি।

— ধর্মের বিগ্রহ ইনি।

— সমুদয় সৃষ্টি ইঁহার।

— সমুদয় সৃষ্টি ইঁহার।

— আমাদের অন্তর এই দেবতা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন।

— আমাদের অন্তর এই দেবতা নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন।

— ইঁহার গোচরে আমরা বিবাহিত হইলাম।

— ইঁহার গোচরে আমরা বিবাহিত হইলাম।

— চিরকাল প্রেমদান করিব।

— চিরকাল প্রেমদান করিব।”[৬৩]

আদর্শায়িত ভঙ্গিতে হলেও নরনারীর চিরন্তন সম্পর্কের সেতুবন্ধন যে বিবাহ তা এখানে লেখক তুলে ধরেছেন। অদস্ মুক্ত এক সুন্দর জীবনের মননের বার্তা ধ্বনিত হয়েছে দুজনের মন্ত্রোচারণের মধ্য দিয়ে। এইভাবে জগদীশবাবু তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের মনোলোকে অবগাহণ করে একজন সুনিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের মতো মনের আনাচে কানাচে বিচরণ করেছেন। এখানেই তাঁর অনন্যতা। তাঁর সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক লিখেছেন—

‘‘...জগদীশ গুপ্ত দেখাতে চান একান্ত জান্তব তাড়না সম্পূর্ণত অন্ধ ও সংকীর্ণ এবং এইটের উপর ভর করেই মানুষ ও জীব এক সোপানে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করার ফলে জগদীশ গুপ্তের লেখায় যৌনতা, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি এত প্রাধান্য পেয়েছে।”[৬৪]

তথ্যসূত্র :

১. জগদীশ গুপ্ত : আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৬১।

২. পাশ্চাত্ত্য দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ২৯৮।

৩. ফ্রয়েড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯০, পৃ. ২৮।

৪. প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃত লোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ২০৬।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৬. জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, বেস্ট বুক্স্, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৩।

৭. রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৭৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৯. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৭২।

১০. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুবতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ৯৩।

১১. উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৩।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

১৮. জগদীশ গুপ্তর গল্প, সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৭।

১৯. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ১৫৫।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

২৪. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ পরিচয় অংশ, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬৩৮।

২৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৯৭।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৫১. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ২৭০।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৫৩. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২৮৪।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৬২. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১৫।

৬৩. কলঙ্কিত তীর্থ, শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ৬১।

৬৪. কথাসাহিত্যের কথকতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ৮৮।